Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান হাফিজাল্লাহ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহবুবা রহমান মুক্তা

রোলঃ ২২৮০২০১৫১

তারিখঃ ০১ জুন ,২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান হাফিজাল্লাহ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহবুবা রহমান মুক্তা

রোলঃ ২২৮০২০১৫১

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহবুবা রাহমান মুক্তা, আইডিঃ ২২৮০২০১৫১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান হাফিজাল্লাহ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি মুজিবুর রহমান উস্তাজ হাফিজাল্লাহ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মাহবুবা রহমান

তারিখঃ ১ জুন, ২০২৫ ইং

(স্বাক্ষর)

মাহবুবা রহমান মুক্তা

আইডিঃ ২২৮০২০১৫১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিশ্বের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান।সংখ্যা গরিষ্ঠতা কখনো কোনো জাতিকে পৃথিবী র বুকে টিকিয়ে রাখে না। বরং কোনো জাতির জীবনাদর্শ, চিন্তাধারা, চরিত্র, নীতি, কর্মপদ্ধতি র প্রভাবই সেই জাতিকে সমাজে টিকিয়ে রাখে।আল্লাহ্ মুসলমানদের বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন, পৃথিবী কে বসবাসের উপযোগী রাখা।অগ্রগামীদের অবশ্যই বিশ্বকে বিভিন্ন বিপর্যয় ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা।এটি এই পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচারকে প্রতিহত করা এবং ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের চিত্র তুলে ধরা। আল্লাহ্ বলেন,

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী। [১]

“আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষী হও এবং নাবী তোমাদের উপর সাক্ষী হয়। আর তুমি এ যাবৎ যে ক্বিবলার উপর ছিলে, তাকে এ উদ্দেশ্যে ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পায়ের ভরে উল্টো দিকে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তারা বাদে অন্যের নিকট এটা বড়ই কষ্টকর ছিল। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, অতি দয়ালু।”[২]

উপরোক্ত আয়াত দুটির নির্দেশ ও বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। মুসলমানরা এই পৃথিবীতে এসেছে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য। নেতৃত্ব বিশ্বের সামনে সত্য ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করুন।

অথচ, সম্প্রতি সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা মুসলমান। তবে কুরআন, হাদিস ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে সর্বোত্তম জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন।আল্লাহ্ বলেন,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا ؕ

----

[১] সুরা আল ইমরান- ১০৪.

[২] সূরা বাকারা-১৪৩.

অর্থ: “তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট।”[৩]

অতীতে মুসলিম বিশ্ব অনেক বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে; বিপরীতভাবে, এটি মারাত্মক বিপর্যয় এবং দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। কখনো মুসলমানরা তাদের ভূমির নিয়ন্ত্রণ হারায়, কখনো তারা শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবের শিকার হয়, আবার কখনো তারা তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। মহানবী (সা.) মদিনার বছর গুলো বিশ্বে ইসলাম ছিল বিজয়ী শক্তি; ন্যায়পরায়ণ খিলাফতের যুগেও ইসলাম ছিল বিশ্বে বিজয়ী শক্তি; এবং আব্বাসীয় যুগেও ইসলাম বিশ্বে বিজয়ী শক্তি ছিল। কিন্তু আজকের যুগে ইসলাম একটি গভীরভাবে ব্যর্থ শক্তি।

তিক্ত হলেও বাস্তবতা হলো, মাত্র চৌদ্দ শতকের ব্যবধানে অনুসারীদের অবহেলার ফলে ইসলামের জ্যোতি অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে জয়ী হয়ে ওঠা মুসলিম জাতি আজ ঈমান ও আমলের দুর্বলতা, কর্মবিমুখতা, জ্ঞানের ঘাটতি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের এক লজ্জাজনক অধ্যায় রচনা করছে। তারা নিজেদের গৌরবময় অতীত ভুলে বসেছে, হারিয়েছে ঐতিহ্যের অহঙ্কার, হারিয়ে ফেলেছে দুর্নিবার মনোবল, অটল চিত্ত ও প্রাণবন্ত বিশ্বাস। জাতি আজ হতাশা ও আত্মবিস্মৃতির গভীরে তলিয়ে গেছে।

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরের যে অবনতি—ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক কৌশলে যে বিপর্যয় আমরা দেখছি—তার মূল উৎস বাহ্যিক দুর্বলতা নয়, বরং ঈমানের শৈথিল্য, মানসিক ভগ্নতা, হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। অথচ বাহ্যিক শক্তি ও উপকরণে আমরা প্রাচীন যুগের মুসলিমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছি।

---

[৩] সূরা ফাতাহ: ২৮

মুসলিমদের সোনালি প্রজন্মের প্রতিফলিত আদর্শ

"ইমানের প্রতি নিষ্ঠা, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামে পূর্ণ নিষ্ঠা—এই গুণাবলিই মুসলিমদের সোনালি প্রজন্মকে আদর্শ ও অমর করে তুলেছিল, যা আজও প্রতিটি মুমিনের জন্য অনুসরণীয় পথনির্দেশ।"মুসলিমদের ইতিহাসে "সোনালি প্রজন্ম" বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবে'ইন, এবং তারও পরবর্তী প্রজন্ম তাবি-তাবে'ইনকে বোঝানো হয়। এই তিন প্রজন্মকে সম্মিলিতভাবে

"খায়রুল কুরুন" অর্থাৎ "সর্বোত্তম যুগ" বলা হয়, যার সাক্ষ্য নিজেই দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)—"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর তাদের যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারপর যারা তাদের অনুসরণ করবে।"[৪]

এই সোনালি প্রজন্ম আল্লাহভীতি, ইখলাস, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য, দ্বীনের প্রচার, জ্ঞান ও আমলের সমন্বয় এবং আখিরাতমুখী জীবনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাদের জীবনব্যবস্থা, চরিত্র ও নেতৃত্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন আদর্শ ও দিকনির্দেশনা হয়ে রয়েছে। দুনিয়ার মোহ, সম্পদ, পদমর্যাদা কিংবা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কখনোই তাদের লক্ষ্য ছিল না; বরং তারা আখিরাতের চিরস্থায়ী সফলতার আশায় জীবনযাপন করতেন। কুরআনের প্রতিটি আয়াত তাদের হৃদয়ে গেঁথে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি হাদীস ছিল তাদের জন্য জীবন বিধান।আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে তারা নিরলসভাবে ইবাদত করতেন, জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতেন এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতেন। তাদের জীবনে ছিল না দ্বিধা, ভণ্ডামি বা গাফেলতি; বরং ছিল সুদৃঢ় ঈমান, অবিচল নৈতিকতা এবং সীমাহীন আত্মত্যাগ। সেই প্রজন্মের মানুষদের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শই ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিকে এতটা মজবুত করেছিল যে, তা অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তারা শুধু কথায় নয়, বরং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ রূপ তুলে ধরেছিলেন। আজকের মুসলিম সমাজ যদি তাদের সেই নিষ্ঠা, তাকওয়া ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থাকে আবার জীবন্ত করে তুলতে পারে, তবে ইসলাম শুধু

---

[৪] বুখারি ২৬৫১;

ইতিহাসের নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও গৌরবময় পথনির্দেশক হয়ে উঠবে। তাঁরা দ্বীনের জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি। এ কারণেই তারা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়েছেন এবং ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মুসলিম উম্মাহর প্রধান গুণাবলী

আল্লাহভীতিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক এবং দ্বীনের প্রতি আত্মনিবেদিত সমাজ গঠন ই মুসলিম উম্মাহর প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই উম্মাহর সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো—তাওহীদে বিশ্বাস। মুসলিম জাতি একমাত্র আল্লাহকে রব, মালিক ও উপাস্য হিসেবে স্বীকার করে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করলেই প্রকৃত মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তৃতীয়ত, এই উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনের সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতা। জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ভূখণ্ডভিত্তিক বিভাজন নয়—তাওহীদের ভিত্তিতেই মুসলমানরা একটি দেহের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকে। এ উম্মাহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আমর বিল মারুফ ও নহি আনিল মুনকার, অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি "উত্তম জাতি"র মর্যাদা অর্জন করেছে। মুসলিম উম্মাহর আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো আখিরাতমুখিতা। তারা বিশ্বাস করে, এই দুনিয়া অস্থায়ী এবং প্রকৃত জীবন হলো পরকালে। ফলে তারা এই দুনিয়াকে আখিরাতের প্রস্তুতির স্থান হিসেবে গ্রহণ করে। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, সহানুভূতি ও দয়া, জ্ঞানার্জনে আগ্রহ, এবং সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মানসিকতা—এসব গুণও মুসলিম উম্মাহর অন্যতম পরিচয়।

আখিরাতমুখী জীবনদৃষ্টি

সোনালি প্রজন্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তারা সবসময় আখিরাতকে সামনে রেখে জীবনযাপন করতেন। তাদের কাছে দুনিয়া ছিল একটি অস্থায়ী অবস্থান, যেখানে তারা পরীক্ষারত। তারা জানতেন, প্রকৃত জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পর। ফলে তাদের কর্ম, সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য সবই ছিল জান্নাত অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, কর্ম এবং মনোভাব ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। দুনিয়ার মোহ, লোভ, সম্পদ ও বিলাসিতার প্রতি তাদের কোনো আসক্তি ছিল না।

وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

"তোমরা পরকাল (আখিরাত) এর ঘরকে অনুসন্ধান করো যা আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।"[৫]

তাদের রাত কাটতো ইবাদতে, চোখ ঝরতো কান্নায়, এবং অন্তর ভরে থাকত আল্লাহর ভয় ও আশায়।

তাওহিদ ও শিরকমুক্ত বিশ্বাস

তাদের ঈমান ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়, এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল। তারা জানতেন, তাওহিদ ছাড়া অন্য কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে উপাস্য মানতেন না, কারো নামে মানত করতেন না, এবং শিরকের সকল রূপ থেকে দূরে থাকতেন। আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরককে ক্ষমা করবেন না।"[৬]

তারা এই আয়াতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিরকের ক্ষুদ্রতম সম্ভাবনাও নিজের জীবন থেকে দূরে রাখতেন। তাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল পরিষ্কার, সরল ও শুদ্ধ।

সুন্নাহর অনুসরণ

সাহাবিদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও শিক্ষা ছিল জীবনের প্রধান দিকনির্দেশনা। তারা রাসূলের যেকোনো আদেশ বা নিষেধকে অগ্রাধিকার দিতেন।

তাদের এ সুন্নাহভিত্তিক জীবনের কারণে ইসলাম তার মৌলিকত্ব ধরে রাখতে পেরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি আমল, বাণী ও অনুমোদিত কাজ তারা অনুকরণ করতেন। তারা নিজেরা কিছু উদ্ভাবন করতেন না, বরং সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গঠনের।আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ٭ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

---

[৫] সূরা কাসাস: ৭

[৬] সূরা নিসা ৪৮

অর্থঃ "রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। "[৭]
সুন্নাহ থেকে সামান্য বিচ্যুতি তাদের কাছে ছিল ভয়াবহ বিদআতের সমান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে দীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরী করবে যা তার অমর্ন্তভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"[৮]
তাদের এই সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা ইসলামকে শুদ্ধ ও প্রামাণিকভাবে আগামীর প্রজন্মে পৌঁছে দিয়েছে।

আখলাক ও চরিত্র

তাদের চারিত্রিক গুণাবলি ছিল অনুপম। সততা, ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা, সাহস, সহনশীলতা—এগুলো ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। তারা মিথ্যা বলতেন না, প্রতিশ্রুতি ভাঙতেন না, কাউকে ঠকাতেন না। তাদের আখলাকই ছিল দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তাদের চরিত্রে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য খুঁজে পেত, ফলে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করত। সাহাবিদের জীবনে ইবাদত যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি আখলাক ও চরিত্র ছিল তাঁদের ইসলামী জীবনের অনন্য দিক। তাঁরা কেবল ইবাদতকারীই ছিলেন না, বরং বাস্তব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তাঁদের কথাবার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-আচরণ, এমনকি শত্রুর সঙ্গেও ব্যবহার ছিল চরম উত্তম।

জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ

সোনালি প্রজন্মের প্রতিটি সদস্য ছিলেন জ্ঞানের পিপাসু। তারা কুরআনের আয়াত, হাদিসের শব্দ, ইসলামী আইন, নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। সাহাবাগণ কখনো কোনো আয়াত শুনলে তা শুধু মুখস্থ করতেন না, বরং তার তাৎপর্য বুঝে, জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, **"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন"** [৯]। সাহাবিগণ এই হাদিসের বাস্তব উদাহরণ।
তাঁদের জ্ঞান অন্বেষণ ছিল গভীর, নিরলস ও ধারাবাহিক। যেমন হজরত আবু হুরায়রা (রা.)—

---

[৭] সূরা হাশর:৭

[৮]সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭ ও সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮, সুনানে আবূ দাউদ ৪৬০৬

[৯] তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৬

যিনি এককভাবে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন—তিনি দিনের বেলা কুরআন শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে থাকতেন, রাতে ইবাদত ও চর্চায় মগ্ন থাকতেন। অনেক সাহাবি জ্ঞান অর্জনের জন্য দিনব্যাপী রাসূল ﷺ-এর দরবারে বসতেন এবং কিছু না কিছু শিখে না ফেরা পর্যন্ত হঠাৎ উঠতেন না। কেউ কেউ দূরদূরান্তে ভ্রমণ করতেন একটি হাদিস জানার জন্য।
এই জ্ঞানচর্চার প্রবণতা তাঁদের চিন্তাভাবনায় প্রগাঢ়তা, নেতৃত্বে দূরদর্শিতা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহস জুগিয়েছে। তাঁদের সেই আত্মনিবেদন আজও মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

উম্মাহর প্রতি দায়বদ্ধতা

তারা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও একতা বজায় রাখতেন। একজনের দুঃখে আরেকজন কাঁদতেন, একজনের প্রয়োজনে সবাই সাহায্য করতেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে "নিজের চাইতে ভাইকে অগ্রাধিকার" দেওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।
আনসারদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে:
“তারা নিজেরাও ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়।” [১০]
এই মনোভাবই মুসলিম সমাজকে একটি শক্তিশালী ও সংহত জাতি হিসেবে গড়ে তোলে।

ইবাদতে নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা

তারা নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ—সব ইবাদতে ছিল অত্যন্ত মনোযোগী। তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া—এসব ছিল তাদের নিত্যদিনের অংশ। তারা ইবাদতকে দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ মনে করতেন। সাহাবিদের ইবাদতের গুণগত মান এত উন্নত ছিল যে, তা সরাসরি তাদের আখলাক, নেতৃত্ব এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হতো। ইবাদত তাঁদের জীবনে কেবল আলাদা একটি কাজ ছিল না, বরং প্রতিটি কর্মই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত ছিল। তাঁরা দিনের বেলায় যুদ্ধ করতেন, রাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। হজরত ওমর (রা.) এর কথা স্মরণযোগ্য—তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ভার বহন করার মাঝেও গভীর রাত পর্যন্ত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং বারবার আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় করতেন।[১১] রাসূল

---

[১০] সূরা হাশর: ৯

[১১] সিফাতুস সাফওয়া

ﷺ এর জীবনে আমরা সর্বদা ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। সাহাবিরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি শিক্ষার্থী ও অনুসারী। তারা ইবাদতে নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ জীবন যাপন করতেন।

জিহাদের চেতনা

জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়; বরং দ্বীনের জন্য সব ধরনের ত্যাগই জিহাদ। তারা জানতেন, ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হলে কখনো কলম, কখনো হাত, কখনো সম্পদ, আবার কখনো প্রাণ দিয়েও লড়াই করতে হয়। আল্লাহ বলেন:

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করো।"[১২]

তাদের এই আত্মত্যাগ ও সাহসের ফলেই ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমদের সোনালি প্রজন্ম ছিল এমন এক প্রজন্ম, যারা কুরআন-হাদিসকে কেবল মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সাহাবিদের জিহাদের চেতনা ছিল বহুমাত্রিক ও পূর্ণাঙ্গ। তারা যুদ্ধক্ষেত্রের শৌর্যের পাশাপাশি আত্মিক, সামাজিক ও জ্ঞানের জিহাদে তৎপর ছিলেন।

---

[১২] সূরা আত-তাওবাহ: ৪১

অধঃপতনের সুচনা

মুসলিম উম্মাহর উত্থান শুরু হয়েছিল হিজরতের পর থেকেই, এবং মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামic খেলাফত বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয় — স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী, উত্থানের পরে যদি সতর্কতা না থাকে, তাহলে পতন আসবেই। মুসলিমদের পতনও আকস্মিক ছিল না, বরং ধাপে ধাপে, কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে এর সূচনা ঘটে।

ক. রাজনৈতিক বিভাজন ও নেতৃত্ব সংকট

খুলাফায়ে রাশিদার যুগের পর মুসলিম খেলাফত ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে রূপ নেয়। হজরত উসমান (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ)-এর সময়কার রাজনৈতিক সংকট মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে প্রথম ফাটল ধরায়। এরপর বিভিন্ন বংশীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একক নেতৃত্বের পরিবর্তে মুসলিম বিশ্ব বিভক্ত হতে থাকে।

৩য় খালিফার খেলাফত:

উসমান ইবন আফফান (রাঃ) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের সদস্য। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দশজনের অন্যতম। উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্য পূর্বে খোরাসান, আফগানিস্তান, আরমেনিয়া এবং পশ্চিমে তিউনিসিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।সমুদ্র অভিযানে তিনি গুরুত্ব দেন, এবং তার সময়েই মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে উসমান (রাঃ)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো কুরআন মজীদের একত্রিকরণ ও প্রামাণ্য মুসাফ প্রচলন। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিকে অবশেষে মুসলিম বিদ্রোহী ভাইদের হাতেই মৃত্যু বরন করতে হয়। উসমান (রাঃ) তার আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেন, যা পরবর্তীতে বিতর্ক ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তার শাসনের শেষের দিকে প্রশাসনিক স্বজনপ্রীতি, কর ব্যবস্থা ও কিছু গভর্নরের আচরণ নিয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ে।বিশেষ করে মিশর, কুফা ও বসরার জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহীরা মদিনায় এসে খলিফাকে চাপ প্রয়োগ করে ও অবরোধ করে রাখে। **৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ৩৫),** এই বিদ্রোহীরা এক পর্যায়ে উসমান (রাঃ)-এর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করে। এটি ছিল ইসলামী ইতিহাসে প্রথম রক্তাক্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, যা পরবর্তীতে মুসলিম জগতে গভীর বিভাজন সৃষ্টি করে (যেমন: শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের সূচনা)।

আলী (রা) র খেলাফতকাল:

খুলাফায়ে রাশিদার চতুর্থ ও শেষ খলিফা। তাঁর খেলাফতকাল ছিল অশান্ত, রাজনৈতিক সংকটে ভরা, এবং মুসলিম ইতিহাসে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। সাহাবায়ে কেরামের সম্মতিক্রমে

হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খেলাফত গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ সময়টি ছিল চরম রাজনৈতিক উত্তেজনায় পূর্ণ।

জামল যুদ্ধ (Battle of the Camel) [১৩] **- ৩৬ হিজরি** আয়েশা (রাঃ), তালহা (রাঃ), ও জুবায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি পক্ষ মদিনা থেকে বের হয়ে বাসরায় অবস্থান নেয়। তারা চেয়েছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচার হোক। হযরত আলী (রাঃ) প্রথমে শান্তিপূর্ণ সমাধানে চেষ্টা করলেও যুদ্ধ বাধে এবং জামল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শেষ হয় হযরত আলী (রাঃ)-এর বিজয়ের মাধ্যমে, তবে বহু সাহাবী শহীদ হন।

সিফফিন যুদ্ধ - ৩৭ হিজরি [১৩] সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচার দাবিতে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। দুই পক্ষের মধ্যে সিফফিন নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলাকালে কুরআন উঁচিয়ে ধরে সালিশের প্রস্তাব আসে (তাহকিম), যেটি মুসলিমদের আরও বিভক্ত করে।

তাহকিম বা সালিশ প্রক্রিয়া হযরত আবু মূসা আশআরি (রাঃ) ও আমর ইবনে আস (রাঃ) সালিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই সালিশের ফলাফল ছিল অনির্ধারিত ও বিভ্রান্তিকর, যা হযরত আলী (রাঃ)-এর অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। এখান থেকেই "খারেজি" গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, যারা হযরত আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের বিরোধিতা করে।

খারেজিদের হাত ধরেই ইসলামি চিন্তাধারার বিকৃতি প্রথম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এতে সাধারণ মুসলমানদের মানসিক জগতে বিশৃঙ্খল ভাবনার প্রভাব পড়তে থাকে। যদিও এ ধরণের প্রবণতার সূচনা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই লক্ষ্য করি, তখন তা ছিল নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার (ধনুক) থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুণ্ডন।[১৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনে আবদল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিরানা” নামক স্থানে দেখা করে। এটি সেই স্থান, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। সাহাবি

----

[১৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[১৪] বুখারি ৭৫৬২

বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের ওপর রুপার টুকরাগুলো রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ মুষ্ঠিবদ্ধভাবে মানুষকে গনিমত দান করছিলেন। তখন উপস্থিত ওই লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ বললেন, ধ্বংস তোমার জন্য। আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে কে ইনসাফ করবে? আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমরা এমন কোনো লোক পাবে না, যে আমার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ ।

সঙ্গে সঙ্গে উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন-না, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যদি এমন করো, তবে লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথিদের হত্যা করি। [১৫]

এই ঘটনাটি ইতিহাসে জুল খুওয়াইসারার ঘটনা হিসেবে পরিচিত। তবে বাস্তবে এটি ছিল একজন ব্যক্তির একক মতামতের প্রকাশ। তখনো এ ধরণের চিন্তাধারা কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক বা সাংগঠনিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এর মূল কারণ ছিল, সে সময় এ চিন্তার বিস্তার খুব সীমিত ছিল।

কিন্তু এই ঘটনার প্রায় চার দশক পরে পরিস্থিতির বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। আলি (রা.)-এর শাসনামলে এ ধরণের ভাবধারা অনুকূল পরিবেশ পেতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এমনভাবে তৈরি হয় যে, তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং অল্প সময়েই সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সময়ে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে—বিশেষ করে মিশর, পারস্য, লোহিত সাগর তীরবর্তী বাইজান্টাইন ভূখণ্ড, ইথিওপিয়া, সুদান এবং উত্তর আরবের রোমান-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন শাম, সিরিয়া ও দামেশক অঞ্চল থেকে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। তাদের অনেকেই মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং নানা রকম রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-দর্শনের মানুষ একই প্ল্যাটফর্মে এসে মিলিত হন, যা নতুন ধারার চিন্তাধারার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।[১৬] এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে খারেজিদের মধ্যে চিন্তার বিশৃঙ্খলা ক্রমশ গেঁথে বসে। ধীরে ধীরে সেই অরাজকতা আরও বিস্তৃত হতে থাকে। একপর্যায়ে তা এতটাই চরমে পৌঁছে যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত সাহাবিদের হত্যা পর্যন্ত শুরু হয়—আর তা কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বৈধ বলে দাবি করে।

এইভাবে শুরু হয় আকিদার বিচার। কে মুমিন, কে কাফির, কার ঈমান শুদ্ধ আর কারটিতে ভেজাল—এসব নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক, বিতর্ক থেকে ফতোয়ার ঝড়। যারা তাদের ফতোয়াকে মানে না, তাদেরকে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয়

---

[১৫] সহিহ মুসলিম : ১০৬৩; সহিহুল জামে : ৫৮৭৮

[১৬] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ; পৃঃ ১৮

নেতৃত্বকে অস্বীকার করে তারা নিজেরাই আকিদা যাচাই, রায় ঘোষণা এবং তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব তুলে নেয়। অথচ এ ধরনের আচরণ সরাসরি উম্মাহর ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভিতকেই দুর্বল করে দেয়।

আরও একটি হাদিসের বর্ণনায় দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখনই তারা আবির্ভূত হবে, তখনই তাদের হত্যা করা হবে। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যখনই এক দল আবির্ভূত হবে তখনই তাদের ধ্বংস করা হবে। এভাবে বিশের অধিক বার তা ঘটবে, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।[১৭] এইভাবেই চিন্তার জগতে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও গভীর ও জটিল রূপ নেয়। কুরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মুসলিম সমাজে একধরনের অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। ফলস্বরূপ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দল নিজেদের মতো করে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে থাকে। নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা অতিরঞ্জনা ও চরমপন্থায় জড়িয়ে পড়ে। তাদের ব্যাখ্যাগুলো বাহ্যিকভাবে কুরআন ও হাদিসের ভাষা ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সঙ্গে ইসলামের মূল শিক্ষা ও চেতনার মিল ছিল না।

এর চেয়েও দুঃখজনক বিষয় হলো—মতভেদ ও চিন্তাবৈচিত্র্যকে সহ্য করার যে উদারতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং তাঁর ওফাতের পর প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছিল, তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে। পরমত সহিষ্ণুতার এই দুর্বলতা আরও বেশি গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্তিকে উসকে দেয়।

খোলাফায়ে রাশেদিনের শেষ পর্বে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার শিকড় ছিল এই চিন্তার নৈরাজ্যেই। আলি (রা.)-এর শাহাদাত এবং কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল এর ধারাবাহিকতা, যা পরিস্থিতিকে আরও নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

এই সময়, আলি (রা.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আবেগ-ভক্তি এতটাই অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে যে তা ইসলামি মূল চেতনা, বিশেষ করে তাওহিদ ও রিসালাতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা থেকেও বিচ্যুত হয়ে পড়ে। একদল মানুষ আলি (রা.)-কে কেন্দ্র করে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচিতি গড়ে তোলে। তারা নিজেদের "শিয়ার-ই-আলি" বা "আলির অনুসারী" বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।[১৮]

---

[১৭] ইবনে মাজাহ : ১৭৪

[১৮] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃঃ২১

শুরু হয় বিতর্ক—আলি (রা.) খিলাফতের কতটা উপযুক্ত ছিলেন, তাঁর মর্যাদা অন্যান্য সাহাবির তুলনায় কতটা বেশি ছিল ইত্যাদি বিষয়ে। এসব অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক মুসলিম সমাজের মধ্যে আরেক দফা চিন্তার নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, যার ফল ছিল—ঐক্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়া।[১৮]

এ সময়ে কিছু বুদ্ধিজীবী ও আলেমও আবির্ভূত হন, যারা এই বিকৃত মতবাদগুলোকে রঙচঙে আকারে উপস্থাপন করতে থাকেন এবং এগুলোকে ইবাদতের নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন—আর তাতে তারা সফলও হন।

এরই মধ্যে খারেজিরাও নিজেদের মধ্যেই নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিয়ারাও একই পথ অনুসরণ করে।

অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন—তারা কি বিভক্ত হতে পারে? কিন্তু এটি কি অনিবার্য ছিল না? যারা ইসলামের প্রথম প্রজন্ম—সাহাবিদের ওপরই বিশ্বাস রাখতে পারেনি, তারা নিজের ব্যাখ্যার ওপর বিশ্বাস রাখবে কীভাবে? অথচ সাহাবিরাই সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ইসলাম শিখেছিলেন।

এই বিভক্তির ধারায় জন্ম নেয় আরও অনেক নতুন দল ও উপদল। যেমন: আলাভি, ইসমাইলি, জায়েদি, নুসাইরি প্রভৃতি। উপমহাদেশেও দেখা যায়—বোহরা, আগাখানি, ইমামিয়া ইত্যাদি বেশ কিছু শিয়া উপদলের অস্তিত্ব।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের পর থেকেই এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ ইসলামের শিক্ষা বিকৃত করতে সচেষ্ট হন। তারা মুসলিম সমাজে নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্র, যা পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।[১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একে একে তিনজন সাহাবি—আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.)—খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের শাসনামলে সমাজে বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার কিছু লোক উপস্থিত থাকলেও তারা কখনোই রাষ্ট্র বা উম্মাহর জন্য বড় কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেনি। কেননা, সে সময় খিলাফতের নেতৃত্ব ছিল দৃঢ়, বিচক্ষণ ও ঐক্যবদ্ধ।

তবে পরিস্থিতি বদলে যায় আলি (রা.)-এর শাসনকালে। সেই সময় উগ্র চিন্তাধারার একটি গোষ্ঠী সমাজে কার্যকরভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাদের বর্বরতার এক জঘন্য দৃষ্টান্ত হলো—আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.) এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করা। এই নির্মম ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আলি (রা.) বাধ্য হন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থেকে এ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে।

---

[১৯] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃঃ২২

এ গোষ্ঠীর উগ্র চিন্তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ৪০ হিজরির ১৭ রমজান, এক জুমার রাতে কুফায় ফজরের নামাজের সময় আলি (রা.)-এর ওপর অতর্কিতে আঘাত করা হয়। তিনদিন পর, ২১ রমজান তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বা ৬৪ বছর। করেছে।[২০]

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো—যারা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল, তারা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও তাকওয়াবান হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা ছিল নিয়মিত ইবাদতকারী, কুরআন পাঠে অগ্রগামী। কিন্তু এতসব দ্বীনি আমলের পরও তারা এমন চরম বর্বরতা করতে পেরেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল—চিন্তার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব। তাদের ছিল আবেগ, ছিল ইবাদতের প্রতি গভীর আগ্রহ; কিন্তু অনুপস্থিত ছিল সঠিক দিকনির্দেশনা ও গভীর দীনী প্রজ্ঞা। এই ভারসাম্যহীনতাই তাদের বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়।

হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকাল ছিল এক কঠিন সময়, যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, গৃহযুদ্ধ, মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা ছিল সাধারণ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে, তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর কারণে তিনি সেই উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সফল হতে পারেননি।

তাঁর শাহাদাত মুসলিম ইতিহাসে এক গভীর ক্ষত রেখে যায়, এবং এখান থেকেই মুসলিমদের ভেতরে বড় ধরনের বিভক্তি সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

খ. আদর্শচ্যুতি ও বিলাসিতা

পরবর্তী শাসকদের অনেকে দ্বীনের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্ষমতা, সম্পদ ও বিলাসবহুল জীবনে লিপ্ত হন। ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের পরিবর্তে পরিবারতন্ত্র, স্বজনপ্রীতি ও দুনিয়ামুখিতা স্থান পায়। এর ফলে জনসাধারণের আস্থা কমে যায় এবং নেতৃত্ব দুর্বল হতে থাকে।মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার লড়াই এবং গোত্রীয় বিভেদ চলে এসেছে। এই বিরোধ মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ঐক্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও নষ্ট করেছে। এর ফলে কার্যকর কোনো ঐক্য গড়ে ওঠেনি—বা বলা যায়, গড়ে তোলার সুযোগই দেওয়া হয়নি।খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল শেষ হওয়ার পর মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উমাইয়া শাসনামল প্রতিষ্ঠিত হয়। **উমাইয়া শাসনামলের সূচনা হয় ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে**, যখন চতুর্থ খলিফা আলি (রা.)-এর মৃত্যুর পর সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.) নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সদস্য, আর তার শাসন থেকেই ইসলামি ইতিহাসে প্রথম রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই থেকে মুসলিম ইতিহাসে নতুন অধ্যায় — **উমাইয়া শাসনামল** শুরু হয়।

———————————————————

[২০] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃঃ২১

উমাইয়া শাসনামল মুসলমানদের পতনের পেছনে ভূমিকা

১. আরব ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্য : উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক এবং সামরিক উচ্চপদগুলিতে আরব জাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। সাধারণত, আরব মুসলমানদেরকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা ও প্রাধান্য প্রদান করা হতো, যেখানে অনারবদের (যেমন পারস্য, তুর্কী, সিন্ধি)কে "মাওয়ালি" বলে উল্লেখ করে নিচু ভূমিকা ও অধিক শাস্তিমূলক কর আরোপ করা হতো। এই পদ্ধতিতে দীক্ষা প্রাপ্ত অনেক অনারব মুসলমান মনে করতেন যে, তারা ধর্মীয়ভাবে সমান সত্তা সত্ত্বেও সামাজিক ও আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পারস্য অঞ্চলের মুসলমানেরা বার বার বৈষম্য ও অবিচারের শিকার হন, যা পরে আব্বাসিদের বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। অনারব মুসলমানদের মধ্যে সংহতি ও সমতা চাওয়ার আন্দোলন শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২. খিলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করা: প্রথমে খিলাফত ছিল উপযুক্ত ও নির্বাচিত নেতার মাধ্যমে পরিচালিত একটি ন্যায়পরায়ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কিন্তু উমাইয়া শাসনে নেতৃত্ব ধারা উত্তরাধিকারভিত্তিক ও পিতামাতার পর পুত্রের হাতে হস্তান্তরিত হতে শুরু করে। এতে ইসলামিক আদর্শ ও শাসন শৃঙ্খলা থেকে বিচ্যুতি ঘটে।

- **মুয়াবিয়া থেকে ইয়াজিদে উত্তরাধিকার:** মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান যখন তার পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফা হিসেবে নিয়োগ করেন, তখন ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী শাসকের নির্বাচন ও যোগ্যতার মানদণ্ড ভেঙে যায়।[২১]
- **কারবালার ঘটনা:** ইয়াজিদের শাসনামলে করা সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ায় নবী মুহাম্মদের নাতি হুসেনকে সহ্য করা যায়নি। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালায় ঘটে যাওয়া এই বেদনা এবং মৃত্যুর ঘটনা ইসলামী সমাজে গভীর শোক ও বিভক্তির সূত্রপাত করে। [২২]

৩. জুলুম ও বিলাসিতা : উমাইয়া শাসনে বেশ কিছু শাসক জুলুমের সাথে বিলাসিতার জীবন যাপন করতেন। রাজস্ব ও সম্পদের অপব্যবহার, কর বৃদ্ধির নীতি এবং সাধারণ মানুষের প্রতি নির্যাতন ও অত্যাচারের ফলে সমাজে অসন্তোষের বন্যা বইতে থাকে। শাসকদের এ ধরনের নীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে ক্ষুন্ন করে।

- **উচ্চ কর ব্যবস্থা:** প্রাদেশিক প্রশাসকদের দ্বারা সাধারণ জনগণের উপর অত্যধিক কর আরোপিত হতো, যা অর্থনৈতিক কষ্টের মুখোমুখি করতো অনেক স্থানীয় মুসলমানকে।

---

[২১] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[২২] আল-তাবারী ; খণ্ড ৪, কারবালার যুদ্ধ

- **প্রতিবাদের ও জুলুম:** অনেক স্থানে এমন ঘটনা ঘটে যেখানে শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সময় যোদ্ধাদের বা সাধারণ জনগণের ওপর শাসন কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। এসব ঘটনার ফলে শাসকের প্রতি আস্থাহীনতা ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। [২৩]

৪. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা: ইসলামের মূল আদর্শ ছিল ন্যায়পরায়ণতা, সৎচারিত্র্য এবং সাম্যের শিক্ষা। তবে উমাইয়া শাসনামলে রাজনীতি, ক্ষমতা ও বিলাসিতার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক ও লক্ষ্য ছিল। শাসকরা প্রায়শই ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাজ্যব্যবস্থার উন্নতিতে মগ্ন থাকেন। এর ফলস্বরূপ, ধর্মীয় নেতা ও আলেমরা সমালোচনার মুখে পড়েন, যা সমাজে আধ্যাত্মিক বিভেদের সৃষ্টি করে।

- **আলেমদের বিরোধিতা:** এমন গল্প-উপাখ্যান আছে যেখানে কিছু আলেম শাসকদের নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, তবে শাসনের পক্ষ থেকে তাদের নিপীড়ন ঘটে।
- **ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের অপব্যবহার:** কিছু শাসক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবকে রাজ্যব্যবস্থার প্রদর্শনী হিসেবে ব্যবহার করতেন, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি সত্যিকার আস্থা ও বিশ্বাস কমে যেতে শুরু করে।[২৪]

৫. দলাদলি ও গৃহযুদ্ধ : উমাইয়া শাসনের সময় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতভেদের কারণে বিশাল পরিসরে গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি হয়। শাসনের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের সংঘাত মুসলিম সমাজে অভ্যন্তরীণ ফাটল সৃষ্টি করে। একদিকে খারিজি মতবাদ আর অন্যদিকে শিয়া ও সুন্নির মাঝে বিরোধ সমাজকে বিভাজিত করে, যার ফলে অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়।

- **খারিজিদের বিদ্রোহ:** খারিজি মতবাদ থেকে উদ্ভূত বিদ্রোহীরা শাসনের বিরোধিতা করে অনেক গ্রাম ও শহরে আক্রমণ চালায়। এ ধরণের বিদ্রোহ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং স্থায়ী শৃঙ্খলার অভাব তৈরি করে।
- **আন্তঃগোষ্ঠী সংঘাত:** মূলত আরব ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে চলা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়, বরং সামরিক ও প্রশাসনিক উচ্চপদে পুরোনো আর নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিরোধের কারণ হয়। এই দ্বন্দ্বই পরবর্তীতে আব্বাসিদের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে, যার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে।[২৫]

[২৩,২৪,২৫] আল-তাবারী, তারীখ আত-তাবারী

"উমাইয়া শাসনের পতন ঘটে মূলত জাতিগত বৈষম্য, শাসকশ্রেণির বিলাসিতা, মাওয়ালি আন্দোলন এবং আব্বাসিদের সুপরিকল্পিত বিপ্লবের কারণে।" [২৬] উমাইয়া খিলাফত তার শাসনামলে আরব জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়। ইসলাম সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম হলেও, উমাইয়া শাসকরা অনারব মুসলমানদের (মাওয়ালি) প্রতি উপেক্ষাপূর্ণ আচরণ করে। ইসলাম গ্রহণের পরও অনারবদের উপর জিজিয়া কর আরোপ এবং সামাজিক বৈষম্য চালু ছিল। ফলে মাওয়ালিদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ জন্ম নেয়। অন্যদিকে, উমাইয়া শাসকেরা ধীরে ধীরে ইসলামী আদর্শ থেকে সরে গিয়ে রাজকীয় বিলাসিতা ও ক্ষমতার কুৎসিত রাজনীতিতে নিমজ্জিত হয়। অনেক শাসক দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, ফলে জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা হারায়। এই পরিস্থিতিতে আব্বাসি বংশ মাওয়ালিদের এবং অসন্তুষ্ট জনগণের সমর্থন নিয়ে একটি সুপরিকল্পিত বিপ্লবের মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটায়। "এই পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়—যেখানে অনারব মুসলমানরাও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।" ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি বিপ্লব সফল হলে, মুসলিম বিশ্বে এক নতুন ধারা শুরু হয়। আব্বাসিরা আরব-অনারব বৈষম্য কমিয়ে মেধা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে পারস্য, তুর্কি, ও মধ্য এশিয়ার বহু অনারব মুসলমান জ্ঞান, প্রশাসন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় নেতৃত্বে অংশ নিতে শুরু করে। এই সময়কালে মুসলিম সভ্যতা বিশেষ করে বাগদাদ-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম বিকাশ লাভ করে।[২৭]

আব্বাসি শাসনামল

উমাইয়া শাসনের অবসানের পর ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হয়। তাঁরা পারস্য ও মাওয়ালিদের সমর্থনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে ক্ষমতায় আসেন।[২৮]

আব্বাসি শাসনামল ছিল জ্ঞান, সাহিত্য ও সভ্যতার এক দীপ্তিময় অধ্যায়। বাগদাদ তখন শুধু ইসলামেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক রাজধানী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই গৌরবময় ইতিহাসের অন্তরালে এমন কিছু দুর্বলতা ও বিপর্যয় জমে উঠেছিল, যা পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক পতনের ভিত্তি রচনা করে।

শাসনের প্রারম্ভিক যুগে আব্বাসি খলিফারা দৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সময়ের প্রবাহে তারা কেন্দ্রীয়তা হারিয়ে ফেলে। খলিফা হয়ে ওঠেন কেবল একটি ধর্মীয় প্রতীক, আর প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসক কিংবা ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে। এভাবে মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় বিভক্তির যুগ—যেখানে একতার পরিবর্তে দেখা দেয় টুকরো টুকরো শাসনব্যবস্থা। স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মিসর এবং পারস্যে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকগোষ্ঠী।

———————————————

[২৬,২৭] আল-তাবারী, তারীখ আত-তাবারী;

[২৮] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

এই রাজনৈতিক দুর্বলতার সাথে যুক্ত হয় ধর্মীয় মতপার্থক্য। শিয়া-সুন্নি বিভাজন, মু'তাজিলা ও হানবলি মতবাদের দ্বন্দ্ব—এসব নিয়ে আব্বাসি শাসনকালে বারবার সংঘর্ষ দেখা দেয়। বিশেষত খলিফা মামুনের আমলে শুরু হওয়া "মিহনা" বা ধর্মীয় ইন্তেহান ছিল মুসলিম ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়, যেখানে ভিন্নমতাবলম্বী আলেমদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এর ফলে জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয় এবং মুসলিম সমাজে বিভক্তি গভীরতর হয়।

অন্যদিকে, রাজপ্রাসাদজুড়ে ছিল বিলাসিতা ও ভোগের প্রতিযোগিতা। খলিফারা নিজেদের চারপাশে তৈরি করেন বিত্তবৈভবের দুর্গ, যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট পৌঁছাত না। করের ভারে কৃষক ও সাধারণ প্রজারা দমে যেতে থাকে, বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে নানা প্রান্তে। এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বাইরের শত্রুদের জন্য মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল করে তোলে।

সামরিক ক্ষেত্রেও একই দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। খলিফারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দাস-সৈন্য, বিশেষ করে তুর্কি ও মধ্য এশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধাদের উপর নির্ভর করতে থাকেন। একসময় এই সৈন্যরাই রাজনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, খলিফাদের পুতুলে পরিণত করে। ফলে খিলাফত হারায় তার মৌলিক শক্তি ও নেতৃত্ব।

প্রথম ধাক্কা:

এই বিভেদের প্রেক্ষাপটে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি মুসলিমরা ইউরোপে প্রথম ধাক্কা খায়। ৭১৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমরা স্পেন পেরিয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে পৌঁছে যায় এবং কিছু বছরের মধ্যে মধ্য ফ্রান্স পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ৭৩১ সালে তারা ফ্রান্সের আর্লস শহরে পৌঁছে।[২৯]

তখন ফ্রান্স নামে কোনো দেশ ছিল না—ছিল গল (Gaul), যা ছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র। মুসলমানদের এই অগ্রগতিতে পোপ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ফরাসি শাসক চার্লস মার্টেল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ 'ব্যাটল অব ট্যুরস' নামে পরিচিত।

এরপর খ্রিষ্টান পাদরিরা গোপনে মুসলিম সমাজে চর পাঠিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। তারা ছদ্মবেশী আলিম পাঠিয়ে মাজহাব নিয়ে বিতর্ক ছড়ায়। মুসলমানরা এসব তর্কে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, কাফির কে, মুনাফিক কে—এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা এমনকি নিজেদের লেখক, বক্তা ও বুদ্ধিজীবীদেরও বিভ্রান্ত করে ফেলে। কিছু পাদরি ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্য দেয় এবং মুসলিমদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের প্রতি দ্বন্দ্ব উসকে দেয়। কিন্তু তখনকার মুসলিম শাসকরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এতটাই নিমজ্জিত ছিল যে এসব গোপন ষড়যন্ত্র তারা বুঝতেই পারেনি। এর ফলে আন্দালুস বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাত্র দুই শতাব্দীতে এটি ২৩টি ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। এসব রাজ্যের ছিল না শক্তি, ছিল না গণভিত্তি, এমনকি ছিল না পরস্পরের ওপর বিশ্বাস।

---

[২৯] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ:-২৫

সুলতান ও আমিররা নিজেদের আত্মীয়স্বজনকেও বিশ্বাস করত না। তারা নিরাপত্তার জন্য জনগণের অর্থে খ্রিষ্টান ভাড়াটে সৈন্য রাখত।

কিছু মুসলিম রাজা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান রাজাদের সহায়তা নিতে শুরু করে। ফলে খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে মুসলিম শাসকরা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রে তারা ইসলামবিদ্বেষী পাদরিদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে শুধু নির্বাসন দিয়ে দায় শেষ করেছে।

অথচ, তখনকার আন্দালুস ছিল বিশ্বের অন্যতম ধনী ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। ইসলামি জ্ঞান ও প্রাচীন জ্ঞান একত্র হয়ে এটিকে বাগদাদ ও দামেশকের সমপর্যায়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে খলিফা হিশামের আমলে মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমেরের ২৭ বছরের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। [৩০]

কিন্তু খলিফা হিশামের মৃত্যুর পরপরই আবারও শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং গোত্রীয় লড়াই। এই দ্বন্দ্ব দ্রুত পুরো সমাজে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম ঐক্য ভেঙে পড়ে।

আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের ইতিহাসে এক সময় এমন এক পর্ব আসে, যখন ক্ষমতা দখলের লালসায় তারা নিজেদের ভাই, চাচা বা পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্র তুলে নেয়। নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কোন্দলের কারণে তারা বাইরের শক্তি—খ্রিষ্টান রাজাদের কাছে সাহায্য চায়। আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকা খ্রিষ্টান শাসকরা এই অনৈক্যের ফায়দা তুলতে একেবারে প্রস্তুত ছিল। ফলে তারা "বন্ধু" সেজে এগিয়ে আসে এবং মুসলিমদের আন্তঃদ্বন্দ্বে সরাসরি অংশ নেয়।

যুবরাজেরা খ্রিষ্টানদের রসদ ও পরামর্শ নিয়ে নিজ পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, খিলাফতের আনুগত্য ত্যাগ করে, এবং নিজেদের ছোট ছোট সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি মুসলিম শাসকেরা প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজাদের বাৎসরিক করও দিতে থাকে, যেন বিপদে তারা তাদের রক্ষা করে।

কিন্তু মুসলিমদের এই বিভাজন ও স্বার্থপরতা চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। কর্ডোভার ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় খলিফা মুসতাইন ও সুলতান মাহদি—দুজনেই খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসোর কাছে সাহায্য চান। মাহদি খ্রিষ্টানদের প্রতিশ্রুতি দেন, বিজয় পেলে মুসলিম দুর্গগুলো পর্যন্ত ছেড়ে দেবেন! কিন্তু ইবনে আলফানসো বিচক্ষণতার সাথে শক্তিশালী মুসতাইনকে সহায়তা দেন। তিনি বুঝেছিলেন, মুসলমানদের এই অন্তর্কলহ খ্রিষ্টানদের জন্য একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। খ্রিষ্টান সৈন্যদের সহায়তায় মুসতাইন মাহদিকে পরাজিত করে কর্ডোভার খলিফা হন। কিন্তু এই বিজয়ের খরচ ছিল অত্যন্ত চড়া। যুদ্ধের দুই পক্ষেই মুসলমান নিহত হয়—নিজেদের হাতেই ধ্বংস হয় মুসলিম সেনাবাহিনী। আর বিজয়ের পর মুসতাইন বুঝতে পারেন, "বন্ধু" খ্রিষ্টানদের সাহায্য

----

[৩০] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ:-২৭

ছিল নিছক কৌশল। কর্ডোভায় প্রবেশ করেই খ্রিষ্টান সৈন্যরা শত শত আলিম, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম জ্ঞানসমাজকে ধ্বংস করে দেয়।

মুসতাইন এই হত্যাকাণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখেন, কিন্তু কিছু করতে পারেন না। অচিরেই তিনি নিজেও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন—তাও আবার সেই খ্রিষ্টানদের হাতেই যাদের তিনি একদিন বন্ধু ভেবেছিলেন।

এইভাবে ক্ষমাতার লোভ ও বিলাসিতার মোহ তাদের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শ চ্যুতি হতে থাকে । এক একে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র এর অংশ হতে থাকে। যা মুসলিম রা নিজেরা তাদের সুযোগ করে দিয়েছিলো। যে খ্রিস্টান রা এক সময় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের নাম শুনে ভয়ে কাপতো তাদের কে তারা এক সময় আবিষ্কার করে ক্ষমতা লোভী ও স্বজনদের ও মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারী হিসেবে আর এই সুযোগ টাই তারা লাগায় । ধীরে ধীরে তারা মুসলিমদের মধ্যে এই কোন্দল আরো বৃদ্ধি করতে থাকে। ইচ্ছা কৃত ভাবে বিভিন্ন মতবাদ তৈরি করে নিজেরা ই ঝামেলা সৃষ্টি করে বিদ্রোহে র পরিবেশ তৈরি করতো। তেমনি একটি ঘটনা **পোপদের সুইসাইড মিশন।**

৯ম শতাব্দীর কর্ডোভায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় এক খ্রিস্টান পাদরি মুসলিম জনসমাগমের মাঝে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে। মুসলমানরা তার উত্তেজনায় তাকে ধরে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু এর মাধ্যমে সে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে 'বীর শহিদ' হিসেবে পরিচিত হয় এবং পোপ ও পাদরিসমাজ এই ধরনের আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়।

এরকম ঘটনা পরবর্তীকালে কর্ডোভা ও সেভিলার মতো শহরগুলোতে বারবার ঘটে, যা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে আস্থা ও সৌহার্দ্যের ফাটল সৃষ্টি করে। সেভিলার সুলতান কিছু পাদরিকে নির্বাসন দেয়, তবুও তারা একই ধরনের উসকানিমূলক কাজ চালিয়ে যায় এবং মুসলিম সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

পাদরিরা মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে Provocative প্রশ্ন করে যেমন — "ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" — যা ইসলামে নিষিদ্ধ ও অপ্রয়োজনীয়। এই প্রশ্নের জবাবে পাদরিরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করে, যা মুসলিমদের ক্রোধ উসকে দেয়।

মুসলিমরা পাদরিদের বিচার করে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কাজিরা পাদরিদের মৃত্যুদণ্ডের বদলে সতর্কবার্তা দেন। তবু খ্রিস্টান নেতারা এ ঘটনাগুলোকে ব্যবহার করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইউরোপে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়।

২৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এ ধরনের উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব চলার পর, ১০৯৬-১০৯৯ সালে পোপ আরবান প্রথম ক্রুসেডের ডাক দেন। সেই সময় মুসলিম বিশ্ব অন্তঃকলে বিভক্ত থাকার কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি এবং ক্রুসেডারদের কাছে হেরে যায়।

১১৬০ সালের মধ্যেই স্পেনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মুসলিমদের হাত থেকে হারানো হয়, এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে স্পেনের ২৩টি মুসলিম রাজ্যের মধ্যে ১৯টি খ্রিস্টান শাসনের অধীনে চলে যায়। মুসলিমরা তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হার মানতে হয়।[৩১]

এই ইতিহাস থেকে শেখা যায়, খ্রিস্টান নেতারা পরিকল্পিতভাবে মুসলিম সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে তোলে, আর মুসলমানরা অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়।

গ. মোঙ্গল আগ্রাসন ও মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য

তেরো শতকের শুরুর দিকে (প্রায় ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ) বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে মোঙ্গল বা তাতারদের আবির্ভাব ঘটে। উত্তর চীন থেকে উঠে আসা এই যোদ্ধা জাতিগোষ্ঠী এক ভয়ংকর সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। চেঙ্গিস খান ছিলেন এই জাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিক বিখ্যাত নেতা। তার অধীনে মোঙ্গল বাহিনী ঝড়ের গতিতে বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়া ও ইউরোপের বড় একটি অংশ তাদের অধীনে চলে আসে।[৩২]

মুসলিম বিশ্বের ওপর তাদের প্রথম বড় ধরনের আঘাত আসে খাওয়ারিজম রাজ্যের মাধ্যমে। এই রাজ্যটির শাসক আলাউদ্দিন মুহাম্মদ চেঙ্গিস খানের দূতদলের অবমাননা করে, ফলে প্রতিশোধ হিসেবে মোঙ্গল বাহিনী বিশাল আক্রমণ চালায়। শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তারা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়।

এই সময় মুসলিম দুনিয়া গভীর রাজনৈতিক সংকটে ছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের ক্ষমতা ছিল শুধু নামমাত্র। বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসকেরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় তারা প্রায়শই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াত। ধর্মীয়ভাবে শিয়া-সুন্নি বিভেদ, ফিকহি মতভেদ এবং একে অপরের ঈমান-আকিদা যাচাই করার প্রবণতা সমাজকে আরও ভেঙে দেয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যিনি সবচেয়ে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেই সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিরা নিজেরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হন। ফলে সিরিয়া, মিশর, হিজাজ—সব অঞ্চলেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। একই রকম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায় আন্দালুস, বাগদাদ ও পারস্য অঞ্চলেও।

---

[৩১] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ:-৩১

[৩২] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ:-৩৪

এই সুযোগে ক্রুসেডার খ্রিস্টানরা একের পর এক হামলা চালাতে থাকে। এবং অন্যদিকে মোঙ্গলদের হাতেও মুসলিম অঞ্চলগুলো একে একে পতনের মুখে পড়ে। এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে **১২৫৮** সালে (৬৫৬ হিজরি) বাগদাদে। মোঙ্গল সেনারা বাগদাদ শহরে প্রবেশ করে প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়, শহরের জ্ঞানভাণ্ডার—বিখ্যাত গ্রন্থাগার, বায়তুল হিকমাহ—পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এমন এক পরিস্থিতিতে অনেকেই ধারণা করত যে মোঙ্গলদের থামানো অসম্ভব। কারণ তারা এত দ্রুত ও নির্মমভাবে যুদ্ধ করত যে, পাহাড়, মরু, নদী—কোনো কিছুই তাদের গতিরোধ করতে পারত না। কিন্তু অবশেষে **১২৬০** সালে ইতিহাস এক নতুন বাঁক নেয়।[৩৩]
এই বছর ফিলিস্তিনের আইন জালুত নামক স্থানে সুলতান কুতুজ ও সেনাপতি বাইবার্সের নেতৃত্বে মুসলিম মামলুক বাহিনী মোঙ্গলদের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। ইতিহাসে এটি "আইন জালুতের যুদ্ধ" নামে পরিচিত। এটি ছিল মোঙ্গলদের প্রথম বড় পরাজয় এবং তাদের 'অজেয়' ভাবমূর্তির ভাঙন শুরু হয় এখান থেকেই। তাদের মনোবলে ধস নামে।
এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর মোঙ্গলদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মোঙ্গল শাসকগোষ্ঠীর একাংশ মুসলমান হয়ে যায় এবং ইসলামি সভ্যতার নতুন অধ্যায় শুরু হয় তাদের হাত ধরে।
মোঙ্গল আগ্রাসনের এই ভয়াবহ অধ্যায় মুসলিম জাতির জন্য যেমন ছিল চরম ধ্বংসের সময়, তেমনি ছিল চেতনা ফেরানোর উপলক্ষ। মুসলিমদের রাজনৈতিক বিভক্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সুযোগ নিয়েই এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। তবে এই সংকটকালে সাহসী কিছু নেতার হাত ধরে আবারও আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে এবং মুসলিম সমাজ নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

ঘ. জ্ঞানচর্চায় স্থবিরতা

এক সময় মুসলিম জাহানে ইসলামি দর্শন, হাদিস, ফিকহ, তাফসির ও ইতিহাস নিয়ে অভূতপূর্ব জ্ঞানচর্চা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এসব চর্চা সীমিত ছিল খানকা ও উস্তাদের আসরে। পরে সমরখন্দ, বাগদাদ, মসুল, দামেশক ও ত্রিপোলির মতো শহরে কাগজ উৎপাদনের কল স্থাপিত হলে এই জ্ঞান সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে থাকে।
এর ফলে অনেকেই ঘরে বসেই দূরের আলিমদের চিন্তা ও মতামতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। এই সময় মুসলমানরা শুধু সংখ্যায় নয়, বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাতেও প্রভাবশালী ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তার কেন্দ্রে ছিল জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ
হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য

---

[৩৩] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ-৩৫

টেনেছেন এবং প্রশ্ন রেখেছেন:

"যারা জানে ও যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?" [৩৪]

এই মূল্যবোধ জ্ঞান সংরক্ষণ ও চর্চার শক্ত ভিত গড়ে তোলে, যা মুসলিম সভ্যতাকে একসময় নেতৃত্বের শীর্ষে পৌঁছে দেয়। জ্ঞানীদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আলিমগণ হলেন নবীদের ওয়ারিশ।"[৩৫]

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন:

" নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আলিমদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। আর ফেরেশতারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন।"[৩৬]

জ্ঞান কেবল একজন ব্যক্তির পার্থিব জীবনের জন্যই কল্যাণকর নয়; বরং মৃত্যুর পরেও তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে চিরকাল কল্যাণের উৎস হয়ে থাকে। একজন জ্ঞানী যে ইলম প্রচার করেছেন ও শিক্ষাদান করেছেন, তা তার মৃত্যুর পরেও মানুষের উপকারে আসে এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য সওয়াবের ভাণ্ডার অব্যাহত রাখে।

সমরখন্দ, বাগদাদ, দামেশক, মসুল, কায়রো কিংবা কর্ডোভা—যেখানেই হোক, সর্বত্রই জ্ঞানার্জনের এক অভূতপূর্ব জোয়ার শুরু হয়। এই বুদ্ধিবৃত্তিক জোয়ারের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সেই সময়ে একের পর এক বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের আবির্ভাবে। পারস্য হোক কিংবা আন্দালুস—ইসলামের সান্নিধ্যে এসে এ সমাজগুলোয় উন্মোচিত হয় জ্ঞানচর্চার এক নতুন দিগন্ত। অষ্টম শতকের শেষভাগ ও নবম শতকের শুরুতে ফিকহ, হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি শাস্ত্রচর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সেইসঙ্গে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনাও চলতে থাকে। সিহা সিত্তা-এর ছয়জন ইমামের মধ্যে ইমাম মালেক (রহ.) ব্যতীত সবাই মধ্য এশিয়া, পারস্য ও পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল থেকে এসেছেন। এই সময়েই আবির্ভূত হন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিছু মনীষী—যেমন পারস্যের জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-ফাজারি, আল-খাওয়ারিজমি, আল-ফারঘানি, আল-মাহানি, আল-বেরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে হায়সাম ও উমর খৈয়াম।[৩৭] অন্যদিকে আন্দালুসে ছিলেন আল-জাওয়াহিরি, কর্ডোভার ইবনে হাজাম, টলেডোর আল-জারকাউই এবং সিরিয়ার আল-বাত্তানি প্রমুখ। এই মনীষীরা তাঁদের নিজ নিজ আবাসভূমিতে জ্ঞানচর্চার বিপ্লব ঘটান। কারও কারও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও অধিকাংশই একান্ত নিজস্ব উদ্যোগেই এই জ্ঞানযজ্ঞে ব্রতী হন। তারা বিশ্বের যেখানেই জ্ঞান পেয়েছেন, তা আত্মস্থ করেছেন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই আলোকে নতুন জ্ঞান, চিন্তা ও দর্শনের জন্ম দিয়েছেন।[৩৭] প্রমুখ।

———————————

[৩৪] সুরা জুমারঃ ৯

"[৩৫] সহিহ বুখারিঃ ১/৩৭; সহিহ মুসলিমঃ ৪/২০৭৪

[৩৬] জামে আত – তিরমিজিঃ ২৬৮৫

[৩৭] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ-৫৬

এই মনীষীরা তাঁদের নিজ নিজ আবাসভূমিতে জ্ঞানচর্চার বিপ্লব ঘটান। কারও কারও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও অধিকাংশই একান্ত নিজস্ব উদ্যোগেই এই জ্ঞানযজ্ঞে ব্রতী হন। তারা বিশ্বের যেখানেই জ্ঞান পেয়েছেন, তা আত্মস্থ করেছেন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই আলোকে নতুন জ্ঞান, চিন্তা ও দর্শনের জন্ম দিয়েছেন।[৩৮]

এই ধারাবাহিকতা রীতিমতো এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটায় মাত্র দেড় শতাব্দীর মধ্যেই। শতাব্দীর জনৈক পশ্চিমা খ্রিস্টান গবেষক এর মতে,

“মাত্র ১৫০ বছরের মধ্যেই আরবরা দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রিকদের সকল সাহিত্য রচনাকে অনুবাদ করে ফেলল। অচিরেই আরবি ভাষা বিজ্ঞানচচার ফেরেলাটিন ভাষার চুলভিষিত" হরে আ উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম একটি সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করল এবং নবম শতাব্দী নাগাদ অধিকাংশ মুসলিম শহরগুলোতেই বিশ্ববিদ্যালয় ধাঁচের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পত্তন শুরু হতে থাকল। এ রকমই একটি হলো কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, যা প্রায় হাজার বছরের বেশি সময়কাল ধরে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে অধিষ্ঠিত।” [৩৯]

তৎকালীন জ্ঞানানুসন্ধানীরা দূরদূরান্তে ছুটে গেছেন বরেণ্য শিক্ষক ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে ইলম আহরণ করতে। কেবল মুখে মুখে জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি নয়, বরং তারা বইপত্র, ভ্রমণ, গবেষণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি নলেজ-বেজড কমিউনিটি গড়ে তুলেছেন।

এভাবেই ইসলামী সভ্যতার সর্বত্র—প্রতিটি শহর, জনপদ, সমাজে—বিদগ্ধ আলিম, চিন্তাবিদ ও গবেষকেরা জন্ম নেন। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের ভিত্তি রচিত হয়, যার প্রভাবে শুধু মুসলিম বিশ্ব নয়, গোটা মানবসভ্যতা উপকৃত হয়েছে।

কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও বিজ্ঞান ছাড়াও, ইসলামি জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগে মুসলিম সমাজে দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এই সময়ে গড়ে ওঠে দর্শনের নানা শাখা ও উপশাখা, যার মাধ্যমে মুসলিম দার্শনিকগণ মানবচিন্তা ও আত্মবিকাশের গভীর অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন শহরে আত্মপ্রকাশ করেন এমন সব দার্শনিক, যাঁরা পরবর্তী সময়ে গোটা মানবজাতির চিন্তাভাবনার ধারাকে প্রভাবিত করেছেন দীর্ঘকালব্যাপী। ইসলামি দর্শনে আল কিন্দি, আল রাজি, আল ফারাবি, আল সিজিস্তানি, নাসির খসরু, ইমাম গাজালি, ইবনে তুফাইল, ফখরুদ্দিন রাজি ও ইবনে আরাবি প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা কেবল দর্শনেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না—তাঁদের অনেকেই বিজ্ঞান, গণিত, নৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব ও রাজনীতিতেও বিশেষ অবদান রেখেছেন।

এই মনীষীগণ ও তাঁদের ছাত্রগণ দর্শনের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেছেন। তাঁরা গ্রিকো-হেলেনিক, টলেমীয় ও প্রাচ্যের ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন

---

[৩৮] মুসলিম উম্মাহর পতন উত্তরণের পথ;পৃ-৫৭

[৩৯] The House of Wisdom, How the Arabs transformed western civilization, Jonathan Lyons, পৃ.৬৪, মুসলিম উম্মাহর পতন; উত্তরণের পথ; পৃষ্ঠাঃ ৩৬

এবং সেসবের সঙ্গে ইসলামি চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এর ফলে দর্শনের অনেক বিষয়ে নতুন নতুন ব্যাখ্যার জন্ম হয়। মতবিরোধ ও তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে ইসলামি দর্শনচর্চা আরো পরিণত, বহুমাত্রিক ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ কুরআনে আমাদেরকে সতর্ক করে দেন:
"হে মুমিনগণ! যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতি করে না বসো, ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমরা অনুতপ্ত না হও।" [৪০]
এই নির্দেশনা কেবল সংবাদের জন্য নয়, বরং যে কোনো জ্ঞান, তথ্য বা তত্ত্ব গ্রহণের আগে প্রাথমিক যাচাই ও ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে পর্যালোচনার অপরিহার্যতার কথাই বলে।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম সমাজ যখন গ্রিক, হিন্দু বা পারস্যের দর্শনের জগতে প্রবেশ করে, তখন সেখানে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার খুঁজে পায়। আল ফারাবি, আল রাজি, ইবনে সিনা প্রমুখ এই জ্ঞানসম্ভারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ইসলামি চিন্তার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেন। কিন্তু এই ধারায় এক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ আক্বিদাগত ভিত্তি বা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতিকে উপেক্ষা করে নিছক যুক্তিবাদ ও দার্শনিক কল্পনার দিকে ঢলে পড়েছেন। এই ব্যত্যয় ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক।
ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমরা বস্তুগত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুন্নত বেদুইন সমাজ ছিল। পার্শ্ববর্তী পারস্য ও রোমান সভ্যতার তুলনায় তাদের কোনো বৈষয়িক আধিক্য ছিল না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঈমান বা বিশ্বাসের যে শক্তি ছিল, তা তাদেরকে আভ্যন্তরীণভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভব দিয়েছিল। তাই তারা অন্য জাতির কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করলেও কখনো আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয়নি বা অন্যদের সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়নি।
তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রহণে ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা ও ঈমান অটুট রাখত। শত্রুদের উন্নত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের অন্তর কখনো তাদের সামনে পরাজিত হয়নি। তারা জানত, প্রকৃত সম্মান শুধু আল্লাহ, রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই সংরক্ষিত। মুসলিমরা শত্রুদের সমস্ত কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। বরং প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করেছিল, যেখানে ইসলামী বিশ্বাস ও আকিদার পরিপন্থী কিছু ছিল না। যেমন—তারা গ্রিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করলেও পৌত্তলিক রূপকথা ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা বর্জন করেছে।
কিন্তু পরবর্তী যুগে মুসলমানদের মধ্যে এই বোধ ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে যায়। মুসলিমরা পশ্চিমা সভ্যতা ও প্রযুক্তির প্রতি অন্ধ মুগ্ধতায় পড়ে যায় এবং যাচাই-বাছাই ছাড়াই সব কিছু গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা আর ইসলামকে তাদের চিন্তা ও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করেনি। এর ফলে, তারা বাহ্যিকভাবে আধুনিক হলেও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
এভাবে মুসলিম সমাজে আত্মবিস্মৃতি, পরাজিত মানসিকতা এবং আকিদাগত দুর্বলতা বিস্তার লাভ

[৪০] সূরা হুজুরাত, ৪৯:৬

করে। পশ্চিমা সভ্যতার গ্রহণ তখন আর জ্ঞান আহরণ নয়; বরং এক ধরনের আত্মসমর্পণে পরিণত হয়। প্রথম যুগের মুসলমানরা আত্মমর্যাদাশীল ও বিশ্বাসে অটল থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেছিল, যা তাদের সম্মানিত করেছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের মুসলমানরা ঈমান ও পরিচয়ের জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে, যাচাই-বাছাইহীনভাবে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করে আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য তারা এখন বিজয়ের পরিবর্তে অবনতির মুখে।

আব্বাসি যুগে মুসলিমরা জ্ঞান ও গবেষণার শীর্ষে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নতুন চিন্তা, গবেষণা ও নব উদ্ভাবনের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। "তাকলীদ" বা অন্ধ অনুসরণ প্রাধান্য পায়, ফলে মুসলিম সমাজ স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইউরোপ রেনেসাঁ ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের শুরুর দিক, বিশেষ করে ৮ম থেকে **১১শ** শতক পর্যন্ত, মুসলিম সভ্যতার জন্য ছিল এক স্বর্ণযুগ। বাগদাদ ছিল সেই সময়ের বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানী। খলিফা হারুন রশিদ ও আল-মামুনের মতো শাসকেরা জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্য বিশাল পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। আল-মামুন প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত "বায়তুল হিকমাহ" বা House of Wisdom, যেখানে গ্রীক, ফারসি ও হিন্দুস্তানী গ্রন্থ অনুবাদ করে জ্ঞানসমুদ্র গড়ে তোলা হয়। এই সময়ে: আল-খাওয়ারিজমি আবিষ্কার করেন বীজগণিত (Algebra)। ইবনে সিনা রচনা করেন 'আল কানুন ফিতিব' (Canon of Medicine), যা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত বছর পাঠ্য ছিল। ইবনুল হাইথাম আলো নিয়ে গবেষণা করে আধুনিক অপটিকসের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইবনে রুশদ (Averroes) ছিলেন অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যাকার হিসেবে। মুসলিম বিশ্বে তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বিস্তৃত হতে থাকে। ইজতিহাদ, যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ও স্বাধীন চিন্তার জায়গায় আসে 'ইমাম অমুক বলেছেন, তাই সেটাই চূড়ান্ত' — এই ধরণের মনোভাব। চার মাযহাবের গণ্ডির মধ্যে চিন্তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অনেক জায়গায় মতবিরোধকে 'বিদআত' বা বিভ্রান্তি হিসেবে দমন করা হয়। এক সময়কার প্রাণবন্ত বিতর্ক, দর্শনচর্চা ও গবেষণার পরিবেশ হয়ে পড়ে নীরস, সীমাবদ্ধ এবং একঘেয়ে। জ্ঞানচর্চা হয় শুধু পুরনো মতবাদ পুনরাবৃত্তির জন্য, নতুন প্রশ্ন বা বাস্তব জিজ্ঞাসার কোনো জায়গা থাকে না। এক সময় মুসলিমরা দর্শন, বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা থেকে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৪১]

যখন মুসলমানরা চিন্তা ও যুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তখন ইউরোপ মুসলমানদের সংরক্ষিত সেই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল। আন্দালুসের কর্ডোভা, টলেডো ও গ্রানাডায় মুসলিম লাইব্রেরি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এসে আরবি ভাষা শিখে গ্রন্থ অনুবাদ করত। গ্রীক দর্শনের অনেক গ্রন্থ মুসলিমদের অনুবাদের মাধ্যমেই ইউরোপে প্রবেশ করে।

এরপর ইউরোপে ঘটে পুনর্জাগরণ , যা ছিল শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী চিন্তার নতুন

———————————————

[৪১] The House of Wisdom,How the Arabs transformed western civilization,Jonathan Lyons

জোয়ার। এই ধারার মধ্য দিয়েই আসে Scientific Revolution, যেখানে গ্যালিলিও, নিউটন, কেপলার, বেকন প্রমুখ নতুন বৈজ্ঞানিক দিগন্ত উন্মোচন করেন। মুসলিম জগৎ পিছিয়ে পড়ল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে। ইউরোপ হলো আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির কেন্দ্র। মুসলমানরা হয়ে পড়ে আত্মতুষ্ট, ইউরোপ হয়ে ওঠে উদ্যমী ও অনুসন্ধিৎসু। মুসলিম বিশ্বের এই বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা এবং ইজতিহাদ থেকে তাকলীদে ঝুঁকে পড়া একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতারও। অন্যদিকে, ইউরোপ যখন মুসলিমদের ছেড়ে যাওয়া জ্ঞানের উত্তরাধিকার নিয়ে এগিয়ে যায়, তখন নতুন সভ্যতা গড়ার নেতৃত্বও তারাই নিতে থাকে।

ঙ. স্পেনের পতন ও মুসলিম অনৈক্য

স্পেনের আন্দালুস ছিল মুসলিম সভ্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে অনৈক্য, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও একক নেতৃত্বের অভাবে মুসলিমরা স্পেন হারায়।

এক সময়ের গৌরবময় মুসলিম আন্দালুস (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগালের বেশিরভাগ অঞ্চল) ছিল ইউরোপের এক উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞাননির্ভর সভ্যতার কেন্দ্র। কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিয়া, টলেডোর মতো শহরগুলো ছিল জ্ঞানচর্চা, স্থাপত্যশিল্প, বিজ্ঞান ও সহাবস্থানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিরা এখানে একসাথে বসবাস করত এবং ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অনন্য পরিবেশ বিরাজ করত। কর্ডোভা পরিণত হয় ইউরোপের সবচেয়ে বড় শহর এবং বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক কেন্দ্র। আন্দালুসে নির্মিত হয় বিখ্যাত মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগার। আন্দালুসের মুসলমানরা একসময় ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে:

ক্ষমতার লোভে মুসলিম নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ করতে থাকে।

অনেক সময় মুসলিম শাসকরা খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর সাহায্য চেয়ে অন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এই বিভক্তি মুসলিমদের দুর্বল করে তোলে, আর খ্রিস্টান রাজ্যগুলো সুযোগ নেয়।

ঘটনাক্রমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ: ১০৮৫ সালে টলেডো খ্রিস্টানদের দখলে যায়। ১২১২ সালের আল-উকাবের যুদ্ধ ছিল একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা, যেখানে খ্রিস্টানরা বড় জয় পায়। একে একে মুসলিম রাজ্যগুলো খ্রিস্টানদের হাতে পতিত হয়। ১৪৯২ সালে গ্রানাডা — ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী বছর। এ বছর আন্দালুসের শেষ মুসলিম রাজ্য 'গ্রানাডা' খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার হাতে পতিত হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপে প্রায় ৮০০ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং স্পেন পুরোপুরি খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[৪২]মুসলিমদের এই পতনের মুল কারন ছিল, মুসলিম শাসকদের মধ্যে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লোভ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল প্রধান কারণ। অনেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান রাজাদের সহায়তা নেয়—যা ছিল ঐক্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আত্মতুষ্টি, বিলাসিতা ও ধর্মীয় কর্তব্যে

---

[৪২] মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস , এসএম ইমামউদ্দিন

অবহেলা শাসকদের দুর্বল করে তোলে। মুসলমানরা যখন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন খ্রিস্টানরা ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আক্রমণ ও পুনর্দখল কৌশল চালাতে থাকে। যার ফলে ,মুসলমানদের সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা ও ঐতিহ্য হারিয়ে যায়। হাজার হাজার মুসলমানকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয় বা দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। স্প্যানিশ ইনকুইজিশন [৪৩] নামে ভয়াবহ দমন অভিযান শুরু হয়—যেখানে মুসলমান ও ইহুদিদের অত্যাচার ও হত্যা করা হয়। ইউরোপে মুসলমানদের অবদানকে ধ্বংস করে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলে।

চ. উপনিবেশবাদ ও পাশ্চাত্যের আগ্রাসন

১৭শ থেকে ২০শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তি মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশ গঠন করে। ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচরা মুসলিম সমাজে নতুন প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। মুসলিমদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদা হারিয়ে যায়। মুসলিম বিশ্ব এক সময় জ্ঞান, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। কিন্তু মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নেতৃত্ব সংকট, অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং জ্ঞানচর্চার স্থবিরতা ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজকে দুর্বল করে তোলে। আর এই সুযোগেই ইউরোপে একদিকে রেনেসাঁ, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লব ঘটে; অন্যদিকে শুরু হয় উপনিবেশবাদের ভয়াল যুগ, যার মূল লক্ষ্য ছিল: প্রাকৃতিক সম্পদ, বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ মুসলিম শাসনের পতনের সূচনা করে। এরপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ সরকার পুরো ভারত দখল করে নেয়। মুসলিমদের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থনীতি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের আগ্রাসন মিসরে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তারের সূচনা করে। পরে ব্রিটিশরা সুয়েজ ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং মিসরকে একটি উপনিবেশে পরিণত করে। ফ্রান্স আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কোর মতো মুসলিম দেশগুলো দখল করে নেয়। স্থানীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি দমননীতি ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। ডাচরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দ্বীপরাষ্ট্রকে দখল করে কয়েকশ বছর শাসন করে। যার প্রভাব সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্য পরে,

রাজনৈতিক অধীনতা:

মুসলিমরা তাদের শাসনব্যবস্থা হারিয়ে ফেলে; ইউরোপীয়রা তাদের অনুগত প্রশাসক বসিয়ে দেয়। খেলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়, বিশেষ করে ১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফতের পতন মুসলিমদের ঐক্যের শেষ প্রাচীর ভেঙে দেয়।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন:

ইসলামি শিক্ষা, ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি দমন করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তাধারা চাপিয়ে দেওয়া হয়—ফলে মুসলিম সমাজে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়।

---

[৪৩] Henry Kamen, The Spanish Inquisition: A Historical Revision, Yale University Press, 1997

অর্থনৈতিক শোষণ:

প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিজ উৎপাদন ইউরোপে পাচার করা হয়। স্থানীয় শিল্প-কারখানা ধ্বংস করে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার গড়ে তোলা হয়। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম অঞ্চল থেকে তুলা, খনিজ, খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যায়। একই সাথে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।

অর্থনৈতিক শোষণ:

প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিজ উৎপাদন ইউরোপে পাচার করা হয়। স্থানীয় শিল্প-কারখানা ধ্বংস করে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার গড়ে তোলা হয়। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম অঞ্চল থেকে তুলা, খনিজ, খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যায়। একই সাথে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।

শিক্ষায় দিকভ্রান্তি:

মুসলিমদের প্রাচীন বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে পাশ্চাত্য ঘরানার ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ইসলামি দর্শন ও বিজ্ঞানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উপনিবেশবাদ ছিল একটি সুপরিকল্পিত ও নির্মম আগ্রাসন, যার মাধ্যমে ইউরোপীয় শক্তিগুলো মুসলিম দুনিয়াকে রাজনৈতিকভাবে টুকরো টুকরো করে, অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিভ্রান্ত করে দেয়।

ছ. খিলাফতের চূড়ান্ত পতন (১৯২৪)

উপনিবেশবাদ ও পাশ্চাত্য আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় মুসলিম খেলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে ১৯২৪ সালে।[88] এই পতন ছিল বহু শতকের রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত দুর্বলতার পরিণতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানি খেলাফত ভেঙে পড়ে এবং কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে খেলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এ ছিল মুসলিম ঐক্যের প্রতীকী পতন, যার ফলে উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে জাতি-রাষ্ট্রের ভিত্তিতে। খিলাফতের চূড়ান্ত পতনে শুধু পাশ্চাত্য আগ্রাসী শক্তিরই নয়, মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ও ভুল সিদ্ধান্তেরও বড় ভূমিকা ছিল। একে শুধু বাইরের ষড়যন্ত্র বা সামরিক পরাজয় হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; বরং মুসলমানদের ভেতরে থাকা নেতৃত্ব সংকট, অনৈক্য, দুনিয়াপ্রীতি, এবং আদর্শচ্যুতি—এসবই খিলাফতের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। খেলাফত মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক হলেও, অনেক মুসলিম শাসক তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ ও রাষ্ট্রভিত্তিক পৃথক পৃথক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দেয় (যেমন: আরব জাতীয়তাবাদ, তুর্কি জাতীয়তাবাদ)। খেলাফতের প্রতি আনুগত্যের বদলে অনেকে নিজেদের আঞ্চলিক ক্ষমতা ধরে রাখাকেই প্রাধান্য দেয়। মুসলিম সমাজের অনেক শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আধুনিকতার মানদণ্ড ধরে নেয়।

---

[88] Histroy of the Ottomans,Professor Md. Abdul Karim & D. Md. Abul Kalam,পৃঃ ২২২

তারা খেলাফত ও ইসলামি শাসনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। যখন ১৯২৪ সালে তুরস্কে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত বিলুপ্ত হয়, তখন গোটা মুসলিম বিশ্বে বড় কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ দেখা যায়নি। উম্মাহ দুনিয়াবি ব্যস্ততায় মগ্ন ছিল, খেলাফতের গুরুত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে তেমন চিন্তা-আলোচনা দেখা যায় না। কিছু ওলামা প্রতিবাদ করলেও, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্বমুসলিমকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হন। 'খিলাফত আন্দোলন' উপমহাদেশে একটি বড় প্রতিরোধ হিসেবে উঠে এলেও (খাস করে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে), তা রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে সফল হয়নি। খিলাফতের পতন শুধু বাইরের আগ্রাসনের ফল ছিল না; বরং মুসলিম উম্মাহর: নেতৃত্বহীনতা, জাতিগত বিভক্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, আদর্শচ্যুতি, এবং ঈমানি দুর্বলতার ফলাফলও ছিল।

উম্মাহর আত্মঘাতী পাঁচ দিকচ্যুতি

আজকের মুসলমানদের একটি বড় অংশ তাদের দ্বীন থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এরা এমন একটি মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছে, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত এবং একই সাথে অমুসলিম দর্শনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্তও নয়। এক ধরণের বৈপরীত্যপূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করেছে তারা—যেখানে তারা ইসলামের দাবিদার হলেও ইসলামের আদর্শে জীবন পরিচালনায় আগ্রহী নয়। ফলে তাদের চিন্তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত এবং কার্যত: আত্মবিরোধী।

এই দ্বৈত চরিত্র তাদের আত্মপরিচয়কে দুর্বল করে তুলেছে। তারা একদিকে ইসলামি আদর্শের সাথে আত্মিক ও আবেগিক সম্পর্ক রাখতে চায়, অন্যদিকে পশ্চিমা বস্তুবাদী ও সুবিধাবাদী দর্শনের অনুসরণ করে চলে। এর ফলে তারা কোনো পক্ষেই সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হতে পারছে না। ফলাফল হচ্ছে চরম ব্যর্থতা, পেছনে পড়ে যাওয়া, এবং মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হওয়া।

এর বিপরীতে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা তাদের আদর্শে অবিচল থেকেছে, তারা কোনো না কোনো পর্যায়ে সফলতা অর্জন করেছে। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ, কষ্ট ও পরীক্ষা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসের ভিত্তিতে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে, সে-ই চূড়ান্তভাবে বিজয় অর্জন করে।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মাঝেও আদর্শিক দৃঢ়তা হারাননি। তাঁদের জীবনে কষ্ট ছিল, ত্যাগ ছিল, কিন্তু সেই ত্যাগই একদিন বিজয়ের মুকুটে পরিণত হয়েছিল।

বর্তমানে আমাদের সমাজে বস্তুবাদ (Materialism), স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Individualism), পুঁজিবাদী সংকীর্ণতা (Capitalism), আধিপত্যবাদ (Expansionism) এবং ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)—এই পাঁচটি বিষবৃক্ষ মুসলিম উম্মাহর শিকড়ে আঘাত হানছে। ইসলাম যেখানে আত্মশুদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায়বিচার এবং পরকালমুখিতা শেখায়, সেখানে এই মতবাদগুলো মানুষকে শুধু দুনিয়াকেন্দ্রিক করে তোলে, আদর্শহীন ভোগবাদী জীবনের দিকে ঠেলে দেয়।

আমরা যদি এ অবস্থা থেকে উত্তরণ চাই, তাহলে মুসলিম জাতিকে আবার নতুনভাবে আত্মপরিচয়, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ওপর দাঁড় করাতে হবে। কুরআনকে জীবনের গাইডলাইন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহকে বাস্তব রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

বস্তুবাদ (Materialism) এক ধরনের জীবনদর্শন, যেখানে মানুষের চিন্তা ও কর্মধারার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় পার্থিব ভোগ-বিলাস, সম্পদ, খ্যাতি ও আরাম-আয়েশ। এটি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষকে শুধু দুনিয়ার সফলতা অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং আত্মা, আখিরাত ও নৈতিকতার জায়গায় বস্তু ও ভোগকে প্রাধান্য দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত এই বস্তুবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুঃখজনকভাবে, মুসলিম উম্মাহও এই দর্শনের প্রভাবে তাদের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় হারাতে বসেছে।

ইসলাম বস্তুজগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না; বরং তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আধ্যাত্মিক উন্নতির বাহন হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু বস্তুবাদ এই ভারসাম্যকে ভেঙে দেয়। আজ মুসলমানদের একটি বড় অংশ মনে করে, উন্নতি মানেই বিলাসবহুল জীবন, বড় চাকরি, গাড়ি, ঘর ও বাহ্যিক খ্যাতি। এর ফলে মুসলিম সমাজে আখিরাতচিন্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া, ইখলাস, ধৈর্য—এসব মূল্যবোধকে দুর্বলতা মনে করা হচ্ছে। বস্তুবাদ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, ফলে উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও ত্যাগের মানসিকতা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
এই বস্তুবাদী চেতনা মুসলিম নেতৃত্বকেও প্রভাবিত করেছে। আজ অনেক মুসলিম শাসক বা বুদ্ধিজীবী ইসলামি মূল্যবোধের চেয়ে ব্যক্তিগত বিলাসিতা, ক্ষমতা ও রাজনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন। বস্তুবাদের এই প্রভাব মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম বড় কারণ।

স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা পশ্চিমা Individualism এমন এক দার্শনিক ও সামাজিক চেতনা, যেখানে ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়া, স্বাধীনতা, সুখ ও সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মূল্যবোধ হিসেবে দেখা হয়। এই মতবাদে পরিবার, সমাজ, ধর্ম বা উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ নয়, বরং "আমি কী চাই"—সেটাই হয়ে ওঠে সিদ্ধান্তের মূল নির্ধারক। পাশ্চাত্যের এই স্বার্থান্ধ চিন্তাধারা মুসলিম সমাজেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। মুসলিম উম্মাহ, যা ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—আজ তা এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ছে।
ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা আছে, কিন্তু তা উম্মাহর স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের একটি ভারসাম্য ছিল। একজন ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও বিচার করতে পারতেন, কিন্তু সেই চিন্তা সর্বদা উম্মাহর কল্যাণের দিকেই নিবদ্ধ থাকত। আজকের সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, পরিবার ভাঙন, স্বার্থান্ধতা, সামাজিক দায়িত্ববিমুখতা, এমনকি আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিণতি ভয়াবহ। মুসলিম সমাজে আজ নৈতিক অবক্ষয়, আত্মপরিচয়ের সংকট ও উম্মাহবোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। কেউ কারো কথা শুনতে চায় না, কেউ উম্মাহর যন্ত্রণায় কাঁদে না, বরং "আমার জীবন, আমার নিয়ম"—এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে নতুন প্রজন্ম।

পুঁজিবাদী সংকীর্ণতা (Capitalism) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার একটি আধুনিক ধারা, যার মূল ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা অর্জনের প্রতি একাগ্রতা। এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় লাভ বৃদ্ধি, আর মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা বা সামাজিক দায়িত্বাবোধ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যের এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ছায়া আজ মুসলিম সমাজেও পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে ধনী-গরীবের বৈষম্য বাড়ছে, সম্পদের অসম বন্টন প্রবল হচ্ছে এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণির দুর্ভোগ বাড়ছে। ইসলামে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ব্যবসা বা সম্পদ অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং তা একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। কুরআনু করিমে উল্লেখ আছে, "তোমরা আল্লাহর পথে জাকাত দাও এবং নিজেদের জন্য পথের মধ্যে হালাল-

হারাম বজায় রাখো।”[৪৫] অর্থাৎ অর্থনীতি শুধু ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য নয়, বরং সমাজের কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্য। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদে এই নৈতিক দিকটি প্রায়ই হারিয়ে যায়। পুঁজিবাদী সংকীর্ণতা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রান্ত মূল্যবোধ ও মনোভাব সৃষ্টি করেছে। অর্থোপার্জনকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানিয়ে ফেলা হয়েছে, যেখানে ধর্মীয় আদর্শ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিতান্ত অবহেলা করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যায়, প্রলোভন, স্বার্থপরতা এবং নৈতিক অবক্ষয় বিরাজমান। এর ফলে সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, দারিদ্র্য দূর করা যাচ্ছে না, এবং উন্নয়ন অসমতা আরও গভীর হচ্ছে।

আধিপত্যবাদ (Expansionism) হলো এমন একটি রাজনীতি বা নীতি যা কোনো দেশের সীমা বা প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে অন্য দেশ বা অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করে। এটি প্রায়ই সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো তাদের স্বার্থবশত বড় আকারে এলাকা দখল করে, স্থানীয় জনগণের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে। ইতিহাসে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ঊনিশ শতাব্দী ও বিশ শতকের শুরুতে এ নীতি অনুসরণ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বড় অংশকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল, যা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটায়। আধিপত্যবাদ মুসলিম সমাজে বিভাজন, দমন ও শোষণের কারণ হিসেবে কাজ করেছে, যা তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) হল এমন একটি নীতি বা দর্শন, যা রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি কোনও প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার মূল উদ্দেশ্য হলো সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে ধর্মের বাইরে রেখে গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পদ্ধতিতে পরিচালনা করা। তবে অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের অবমূল্যায়ন এবং ধর্মের ভূমিকা কমিয়ে আনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা সংস্কৃতির ক্ষয়, চিন্তার বিভ্রান্তি ও আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি করে। মুসলিম ঐতিহ্যে ধর্ম ও জীবনের অভিন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারনা ইসলামের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

---

[৪৫] সূরা বাকারা: ২১৭

উত্তরণের পথে বাধা

মুসলিম উম্মাহর এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথে প্রাথমিক বাধা পরাজিত মানসিকতা। অতীতের দীর্ঘ সময়জুড়ে দেখা গেছে, মুসলিম জাতি ধীরে ধীরে চিন্তা-চেতনা, মানসিক শক্তি এবং কার্যক্ষমতায় ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ের বাস্তবতা এই বিপর্যয়কে আরও স্পষ্ট এবং প্রকট করে তুলেছে। আজকের মুসলমানদের একটি বড় অংশ তাদের দ্বীন থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এরা এমন একটি মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছে, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত এবং একই সাথে অমুসলিম দর্শনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্তও নয়। এক ধরণের বৈপরীত্যপূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করেছে তারা—যেখানে তারা ইসলামের দাবিদার হলেও ইসলামের আদর্শে জীবন পরিচালনায় আগ্রহী নয়। ফলে তাদের চিন্তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত এবং কার্যত: আত্মবিরোধী।

ক. ইসলামি নবজাগরণে হতাশার বৃত্তে বন্দি উম্মাহ:

বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে এক ধরনের গভীর হতাশা ঘিরে ধরেছে, যা কেবল সাধারণ জনতার মধ্যেই নয়, বরং চিন্তাশীল অনেক মুসলমানের মধ্যেও বিদ্যমান। কেউ যদি আজ মুসলিম জাতির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা করে, তাহলে দেখা যায়—অনেকেই ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম নিরাশায় ভুগছেন। তারা মনে করেন, উম্মাহর এই অবনতির অতল থেকে উত্তরণের আর কোনো পথ খোলা নেই।

এই হতাশাবাদীরা নিজেদের অবস্থানকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে নানা ধরনের প্রবাদ বা চিত্রকল্প ব্যবহার করে থাকেন। কেউ বলেন, "এই চেষ্টাগুলো হলো নিছক অরণ্যে রোদনের নামান্তর।" অর্থাৎ, কেউ শুনবে না, কেউ বদলাবে না—তাই চেষ্টা করা বৃথা। আবার কেউ বলেন, "এটি ফুটো বেলুনে ফুঁ দেওয়ার মতো কাজ।" যে বেলুনে ছিদ্র আছে, সেখানে যতই বাতাস ভরা হোক, তা কোনোদিন পূর্ণতা লাভ করবে না। মুসলিম উম্মাহর অবস্থাও যেন তেমনই—চেষ্টা করে লাভ নেই। এই ধরনের মন্তব্য শুধু তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে না, বরং তা প্রকৃত কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেয়। যারা মুসলিম সমাজে নতুন করে চিন্তা ও চেতনার জাগরণ চান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চান, দ্বীনের দাওয়াহ দিতে চান—তাদের মধ্যেও একধরনের নৈরাশ্য তৈরি হয়। তারা ভাবেন, হয়তো তারা একাই পথভ্রষ্ট, কিংবা এই লড়াইয়ের কোনো ফলাফল আসবে না।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হীনমানসিকতার একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم– أو بالضم– فهو أهلكهم.

অর্থঃ যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, মানুষ সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে মূলতঃ সেই তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করল। অন্য বর্ণনা মতে, সে'ই মুলতঃ ধ্বংসে নিপতিত। [৪৫]

বর্ণিত হাদীসটি সমকালীন মুসলিম সমাজে বিরাজমান মানসিক বিপর্যয়ের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, এক শ্রেণির মুসলমানের মাঝে আত্মসমালোচনামূলক হীনমন্যতা ও কর্মবিমুখতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের অনেকেই 'মানুষ শুনবে না', 'কোনো লাভ হবে না' ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় যুক্তিকে সামনে রেখে দ্বীনের মৌলিক দায়িত্বসমূহ—বিশেষ করে আল্লাহর পথে আহ্বান, অন্যায়ের প্রতিবাদ, এবং নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রচার কার্যক্রম থেকে বিরত থাকছে। এর ফলে, তারা একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস ও ঈমানী দৃঢ়তা হারাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি দ্বীন-প্রতিষ্ঠার অনিবার্য কর্মধারাও শিথিল হয়ে পড়ছে। এ প্রক্রিয়া মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক পরিচয়, দায়িত্ববোধ ও ঐক্যবদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি এক গভীর হতাশার সংস্কৃতি গড়ে তুলছে, যা নবজাগরণের পথে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

খ. বিপর্যস্ত অবস্থায় আত্মসন্তুষ্টির প্রবণতা:

মুসলিম সমাজে একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—অনেকে নিজেদের জ্ঞান, চরিত্র ও কর্মে উন্নত করার পরিবর্তে সর্বদা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে থাকা লোকদের সঙ্গে তুলনা করে আত্মতুষ্টি অনুভব করে। এই মানসিকতা ব্যক্তিকে আত্মসমালোচনার পথ থেকে বিরত রাখে এবং আত্মোন্নতির প্রেরণা নষ্ট করে। অথচ ইসলাম শিক্ষা দেয়, দ্বীনের পথে এগিয়ে থাকা ব্যক্তিদের অনুসরণ করা এবং উন্নত মানসিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছার চেষ্টা করাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগা এই শ্রেণির মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাহীন দূরাবস্থাকে স্বীকার না করে বরং এটিকে আড়াল করার জন্য বলে, "আমরা তো অনেকের চেয়ে ভালো আছি!" এই আত্মপ্রসাদমূলক যুক্তি তাদেরকে জাগরণ ও সংশোধনের পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং উম্মাহর সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।

গ. চিন্তাগত স্থবিরতা ও আত্মনির্ভরতার পরিবর্তে পরনির্ভরতার দাসত্ব

মুসলিমদের একটি বড় অংশ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের প্রতি চরম উদাসীন। তারা যেন নিজেদেরকে কখনোই একজন উদ্ভাবক বা বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বদানকারী জাতি হিসেবে কল্পনাও করে না। এ ধরনের আত্মবিশ্বাসের অভাব তাদেরকে এক ধরনের স্থবিরতা ও পরনির্ভরশীলতার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। আজ বহু মুসলিম দেশ এমন

---

[৪৫] মুসলিম : ২/৩২৯

অবস্থায় পৌঁছেছে যে, নিত্যদিনের সাধারণ চাহিদা পূরণেও তারা অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পর্যন্ত তারা আমদানি করে, যা তাদের অর্থনীতি ও স্বাধীনতাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এই চরম নির্ভরতাই প্রমাণ করে যে, তারা আত্মিক শক্তি ও সম্ভাবনার বিশাল ভাণ্ডার সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ও উদাসীন। একে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দুর্বলতা হিসেবে নয়, বরং একটি মারাত্মক মানসিক ও চিন্তাগত দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মুসলিম সমাজে বর্তমানে চিন্তাগত এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে, যা তাদের সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করেছে। আত্মনির্ভরতার বদলে তারা পরনির্ভরতার অভ্যাসে আটকে পড়েছে। নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস না রেখে, বহু ক্ষেত্রে অন্যদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় তারা নিজস্ব উৎপাদন বা উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে আজকের এই পরিণতিতে পৌঁছেছে। এই পরনির্ভরতাই তাদের মানসিক দুর্বলতার প্রকাশ, যা ভবিষ্যতে নিজেদের উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঘ. বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ

মুসলিম সমাজের একাংশের মাঝে এমন একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যারা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য বা অন্যান্য অমুসলিম দেশে গমন করে এবং সেখানকার জীবনব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার নানা দিক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশে ফিরে আসে। তারা এসব সমাজের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকগুলিও অনুকরণ করে থাকে। এটি স্পষ্টতই তাদের চিন্তাগত দুর্বলতা ও মানসিক বিপর্যয়ের পরিচায়ক। কারণ, তারা কী গ্রহণযোগ্য এবং কী বর্জনীয়—এই মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তারা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পাশ্চাত্যের অধঃপতিত নৈতিকতা ও বিকৃত জীবনচর্যাও স্বদেশে আমদানি করছে।

বাস্তবতা হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এগিয়ে থাকলেও নৈতিকতা, আত্মিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে তারা গভীর সংকটে রয়েছে। তাদের তথাকথিত অগ্রগতি মূলত বস্তুবাদনির্ভর, যা মানবিক উৎকর্ষের প্রতিফলন নয়। বিপরীতে, ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যা মানবিকতা ও নৈতিকতার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। মুসলিম উম্মাহ যদি নিজের এই স্বতন্ত্র আদর্শ ও ঐতিহ্যের ওপর আস্থা রাখে, তবে তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে ইসলামের উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ সভ্যতা গঠন করতে পারে—তাতে বিজাতীয়দের অনুকরণে আত্মবিস্মৃত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

ঙ. মুসলিম নেতৃত্বের আত্মসমর্পণমূলক মানসিকতা

আজকের মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক—প্রায় সবক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণমূলক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে, যা তাদের গভীর মানসিক বিপর্যয়ের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। নানা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কূটনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে মুসলিম নেতারা এমন সব অপমানজনক শর্ত মেনে নিচ্ছেন, যা একসময় কল্পনাও করা যেত না। অনেক সময় তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকেও সরে এসে প্রতিপক্ষের দাবি মেনে নিতে দ্বিধা করেন না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ আজ নির্লজ্জভাবে দাবি করে বসে, "ইসরাইল তো এখন বাস্তবতা—তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলা উচিত।"

এই নতজানু মনোভাব তাদের মানসিকভাবে পরাজিত করে রেখেছে এবং আত্মবিশ্বাসের বলয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। ফলে তারা শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় অবস্থান নিতে অক্ষম, বরং বারবার মাথা নত করাকেই নীতিমালা মনে করছে। অথচ আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

"তোমরা দুর্বল হয়ো না, হতাশ হয়ো না; যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে নিশ্চয়ই তোমরাই শ্রেষ্ঠ থাকবে।" [৪৬]

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান মুসলিম নেতৃত্ব সেই ঈমানি দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উপর ঘটে যাওয়া নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার বদলে, তারা পরাজয় মেনে নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগছে। তাদের উচিত ছিল পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা, অধিকার আদায়ে অনড় থাকা এবং উম্মাহর স্বার্থে বারবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামও এ দুর্বলতা সমর্থন করে ফেলছেন—তাদের বক্তব্য ও অবস্থান কখনো কখনো এই পরাজয়বাদী নীতিকে বৈধতা দিচ্ছে। পরিবর্তনের আহ্বান ও দিকনির্দেশনার পরিবর্তে তারা পরিস্থিতির সাফাই গাইছেন। এটি সত্যিই এক বিপর্যস্ত চেতনা ও ভঙ্গুর আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে।

চ. আত্মপরিচয় গোপনে লজ্জাবোধ ও দুর্বল মানসিকতা

মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে আজ এক উদ্বেগজনক প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে—তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত। এমনকি হালাল-হারামের মৌলিক সীমারেখাও তারা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ

---

[৪৬] আলে ইমরান: ১৩৯

করতে সংকোচ বোধ করে। বিশেষ করে অমুসলিম সমাজে, যখন কোনো হারাম বস্তু গ্রহণের আহ্বান আসে, তখন তারা শুধু ‘না’ বা ‘থ্যাংকস’ বলে এড়িয়ে যায়, কিন্তু সাহসের সাথে বলতে পারেনা: “আমি একজন মুসলিম, এবং আমার ধর্মে এটি হারাম।”এই সংকোচ শুধু মৌখিক নয়—পোশাক-পরিচ্ছদেও তা প্রতিফলিত হয়। অমুসলিম রাষ্ট্রে সফরের সময় অনেক মুসলিম নিজস্ব ধর্মীয় পোশাক পরিধান না করে পাশ্চাত্য পোশাক বেছে নেয়, এমনকি খ্রিস্টানদের সাংস্কৃতিক প্রতীক ‘টাই’-ও ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। এই আত্মপরিচয় বিসর্জনের মূল কারণ হলো একটি আত্মবিস্মৃত ও পরনির্ভরশীল মানসিকতা, যেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অনুসরণ করাই সম্মানের ব্যাপার মনে করা হয়।

অপরদিকে, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম নন, বরং নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের মাঝে ইসলামী আদর্শ ও চর্চা পালনে ঈর্ষণীয় দৃঢ়তা দেখা যায়।নব-মুসলিম যেভাবে ইসলামের প্রতি গর্ব প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের জন্য শিক্ষা। আমরা, মুসলিম পরিচয়ে জন্ম নিয়েও, অনেক সময় দ্বীনের বিধান বাস্তবায়নে পিছপা হই, আশপাশের মানুষ কী ভাববে সেই আশঙ্কায় দ্বীন থেকে দূরে থাকি। অথচ প্রকৃত সাহস ও আত্মমর্যাদা সেখানেই, যেখানে কেউ তার বিশ্বাস ও পরিচয়কে স্বগর্বে তুলে ধরতে পারে।

ছ. সংকীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ ভাবনার দুর্বলতা

আজকের যুগে অনেক আলেম ও দাঈ এমন আছেন, যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সীমিত। এমন উচ্চাভিলাষী মনোভাব বিরল, যার হৃদয়ে দ্বীনকে বিশ্বব্যাপী প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা জাগে। অধিকাংশই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কিছু ইবাদত ও রীতিনীতি পালনেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতি আন্তরিক প্রচেষ্টা অনুপস্থিত।

কিন্তু শরীয়তসম্মত বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা প্রশংসনীয় ও কাম্য। আল্লাহ তাআলা মু’মিনদের এমন গুণের প্রশংসা করেছেন:

অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যাদের দেখে চোখ জুড়ায়, আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানাও।" [৪৭]

এ দুআ কেবল ভালো মুসলিম হওয়ার নয়, বরং মুত্তাকীদের নেতা বা ইমাম হওয়ার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। এ চেতনা জাগ্রত করার জন্য চাই বিশাল মানসিকতা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ।

আজ শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের একাংশ নিজেদের আদর্শ হিসেবে কোনো সমকালীন ব্যক্তিত্ব বা উস্তাদকে মনে করে, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে না। তারা এমনকি উস্তাদকে অতিক্রম করার চিন্তাও করে না; বরং তা বেআদবী মনে করে। ফলে তারা নিজেদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে ফেলে।

---

[৪৭] সূরা আল-ফুরকান: ৭৪

এই মনোভাব অত্যন্ত ভুল ও আত্মঘাতী। যদি ছাত্ররা মনে করে যে, তারা কখনোই তাদের উস্তাদদের চেয়ে বড় হতে পারবে না, তাহলে প্রতিটি প্রজন্ম আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়বে, এবং মুসলিম জাতি ক্রমাগত অবনতি ঘটবে। অথচ ছাত্র যদি উস্তাদকে অতিক্রম করে, সেটা উস্তাদের জন্য লজ্জার নয়; বরং তা গর্বের বিষয়।

আমি আপনাদের প্রশ্ন করি—শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)—তাদের উস্তাদ কারা ছিলেন? আমাদের অনেকেই তা জানি না। কিন্তু তাদের ছাত্র হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি আজও টিকে আছে। প্রকৃত সম্মান অর্জিত হয় অবদান ও কীর্তির মাধ্যমে, নিছক উত্তরাধিকার নয়।

জ. আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করে মানবীয় আইন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

আজকের বাস্তবতায় এক শ্রেণির মুসলিম এমনও রয়েছেন, যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল নন। তারা দ্বীন ইসলামকে কেবল একটি আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম হিসেবে মানতে রাজি, কিন্তু বাস্তব জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। বরং তারা মানব রচিত মতবাদ ও আইনকেই কার্যকর মনে করে এবং সেই অনুযায়ী জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। এমনকি অনেক মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রে ইতোমধ্যেই এসব মানব সৃষ্ট মতবাদ—যেমন সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি—বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা দ্বীনের পূর্ণতা ও যথার্থতার প্রতি নিজেদের আস্থাহীনতা প্রকাশ করেছে। অথচ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেন:

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থঃ "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা কখনোই তার নিকট গ্রহণ করা হবে না, এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [৪৮]

অতএব, ইসলামী শরীয়তের পরিবর্তে মানুষ-নির্মিত আইনকে গ্রহণ করা কেবল একটি ভুল পছন্দ নয়—বরং এটি বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি ও ঈমানী ব্যর্থতার নামান্তর। এটি এমন একটি অবস্থান, যা একমাত্র আল্লাহর প্রতি অবিশ্রান্ত আস্থা, ঈমানের দৃঢ়তা এবং দ্বীনের প্রতি সমর্পণের বিপরীতধর্মী। সুতরাং, দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না করা এবং মানব রচিত আইন ও চিন্তা-ধারার উপর নির্ভর করা শুধু একটি রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় নয়—বরং ঈমানের মারাত্মক দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি।

———————————

[৪৮] সূরা আলে ইমরান: ৮৫

ঝ. উন্নয়নের নামে নারী ক্ষমতায়ন ও নারীবাদী ইস্যু

মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের পথে অন্যতম একটি প্রধান বাধা হলো পশ্চিমা আধিপত্যবাদী চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণ, যার একটি মুখ্য উপাদান হচ্ছে তথাকথিত "উন্নয়নের নামে নারীবাদী (feminist) ইস্যু"। আধুনিক যুগে "উন্নয়ন" এবং "নারী ক্ষমতায়ন" (women empowerment)—এই দুটি ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই নারীবাদী (feminist) মতাদর্শের মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে। পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের অর্থ হলো—নারীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও পারিবারিক কাঠামো থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে জীবনযাপন। এই চিন্তাধারা এমনভাবে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেন এটি একমাত্র উন্নত সভ্যতার চিহ্ন। পশ্চিমা নারীবাদ মূলত এমন একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, যা ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পার্থিব উপভোগবাদকে কেন্দ্র করে গঠিত।[৪৯] এই নারীবাদী চিন্তাধারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পরিবার, নৈতিকতা ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সাংঘর্ষিক।আধুনিক "উন্নয়ন" দর্শনে নারীকে প্রগতির প্রতীক বানাতে গিয়ে তার স্বাভাবিক পরিচয় ও দায়িত্বকে বিকৃত করা হচ্ছে। তাকে ঘর, পরিবার ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল "শ্রমবাজারের অংশ" বা "স্বাধীন ব্যক্তি" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, কর্ম ক্ষেত্রে অসমতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, একক মাতৃত্ব, পারিবারিক ভাঙন ও মানসিক অসন্তোষ বেড়ে চলছে—যা মূলত পশ্চিমা সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত সমস্যা।এই ধারা মুসলিম সমাজেও ছড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে নারীবাদী মতাদর্শকে "উন্নয়ন", "নারী অধিকার", "জেন্ডার সমতা" প্রভৃতি নামে উপস্থাপন করে ইসলামি পারিবারিক কাঠামোতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। নারীদেরকে পুরুষদের মতো বানানোর প্রয়াস চালানো হচ্ছে, অথচ তাদের নিজস্ব সত্তা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশের কোনো চিন্তা নেই।ইসলাম নারীকে সম্মান, অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছে তার স্বাভাবিক ভূমিকা ও প্রকৃতি অনুযায়ী। কুরআন-সুন্নাহ নারীকে শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ ও দাওয়াহ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেছে; তবে এর সবই হয়েছে নৈতিক সীমা ও পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করে। "ইসলাম নারীকে সম্মান, অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছে তার স্বাভাবিক ভূমিকা ও প্রকৃতি অনুযায়ী। কুরআন-সুন্নাহ নারীকে শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ ও দাওয়াহ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেছে; তবে এর সবই হয়েছে নৈতিক সীমা ও পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করে।[৫০]

---

[৪৯] Women in Islam: A Discourse in Rights and Responsibilities; Fatima Umar Naseef

[৫০] Days from My Life; Zainab Al-Ghazali

উত্তরণের পথ (প্রতিকার)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম উম্মাহ এক সময় জ্ঞান, সভ্যতা, ন্যায়বিচার ও নেতৃত্বে বিশ্বে অগ্রণী ছিল। বাগদাদ, দামেশক, কায়রো ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল জ্ঞানের আলোয় আলোকিত। কিন্তু আজ মুসলিম বিশ্বের বড় অংশ অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও নির্যাতনের শিকার। এর কারণ খুঁজলে দেখা যায়—ভিতরের দুর্বলতা, অনৈক্য, নেতৃত্বহীনতা ও আত্মঘাতী চিন্তাধারা বড় দায়ী।

ক. ইসলাম কে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা (Complete Way of Life)। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, এবং আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [৫১]

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলাম শুধুমাত্র ইবাদতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। এটি একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা মানুষের সামগ্রিক জীবনকে অর্থবোধক ও সুশৃঙ্খল করতে পারে।

তাওহীদের সার্বিক বাস্তবতা ও শরিয়াহ কেন্দ্রিক আনুগত্য

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

অর্থঃ “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।”[৫২]

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ

অর্থঃ তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক (তাগুত) আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?[৫৩]

---

[৫১] সূরা মায়িদা ৩

[৫২] সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৭

[৫৩] সূরা আশ-শুরা ২১

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ

অর্থঃ “তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না।” [৫৪]

কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছে যে ইবাদত কামনা করেন, তা কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক উপাসনা বা বাহ্যিক অনুশীলনের নামমাত্র নয়—বরং তা হলো একটি সর্বাঙ্গীণ জীবনব্যাপী আনুগত্য, যেখানে আল্লাহর উলুহিয়্যাহ (উপাস্যরূপে) ও রুবুবিয়্যাহ (জীবনব্যবস্থার অভিভাবকরূপে) স্বীকৃতি দিতে হবে এককভাবে এবং পূর্ণ আস্থা ও স্বীকৃতির সঙ্গে। এই তাওহীদ আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণাবলির একত্বের সাথে সাথে তার বিধান, শাসন ও আইন বাস্তবায়নে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিও করে।

তাই প্রকৃত মুসলমান হওয়ার শর্ত হলো—সকল ইবাদত ও আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহর আইন ও বিধানকে মান্য করা। আল্লাহর শরিয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো উৎস থেকে আইন গ্রহণ করা, তা সে শরিয়তের অনুরূপ হোক বা পৃথক হোক—এই উভয় প্রকারই ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক ও কুফরের সামিল। যেমন, তাতারদের ইয়াসিক নামক সংবিধান গ্রহণের ঘটনা, যেখানে তারা কুরআন ও অন্যান্য উৎস থেকে সংকর আইন তৈরি করেছিল, অথবা এমন পরিস্থিতি যেখানে কোনো জাতি আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে নিজেদের তৈরি আইনকে মান্য করে—উভয় অবস্থাই ইসলামী বিশ্বাসবিরোধী ও ঈমানের মূল কাঠামোর ওপর সরাসরি আঘাত।

আসল তাওহীদ কেবল "আল্লাহ এক" বলায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্ষেত্র—রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা—সবকিছুকে আল্লাহর বিধানের অধীনস্থ করতে চায়। কেবল এই তাওহীদই মানুষকে শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মুসলমান বানাতে পারে। আর একমাত্র এই রূপ ইবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য; এর নিচে কোনো ‘সংস্করণ’ নেই যা আল্লাহর কাছে চলবে।

অন্যদিকে, আল্লাহর সৃষ্টিশক্তি, পরিচালনাকৌশল, রিজিক, মৃত্যু ও জীবন ইত্যাদিতে কোনো সত্তাকে অংশীদার ভাবা, কিংবা কোনো অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে উপকার-অপকার কামনা করা—

—————————————

[৫৪] সূরা আরাফ ৩

এসব শিরকের রূপ, যা মানুষকে ইসলামের সীমানা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। একইভাবে, যদি কেউ আল্লাহর বিধান ছেড়ে মানুষ-নির্মিত আইন দ্বারা শাসিত হতে সম্মত থাকে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তবুও সে ঈমানের মূল শর্ত থেকে বিচ্যুত হয় এবং তা তাকে মুরতাদে পরিণত করতে পারে। এইভাবে, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তা বাস্তবায়নের প্রধান ভিত্তি হলো—তাওহীদের পূর্ণ স্বীকৃতি ও তার অনুশীলন। এটি কেবল অন্তরে বিশ্বাস বা জিহ্বায় উচ্চারণের বিষয় নয়; বরং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য এক পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যা মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার পরনির্ভরতা, বিভ্রান্তি ও আত্মপরিচয় সংকট থেকে মুক্তি দেয়।

চিন্তার ভিত্তি ও দর্শন

ইসলামিক জীবনব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো তাওহিদ, তথা আল্লাহর একত্ববাদ—যেখানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে এই দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে। ইসলাম মানুষকে স্বতন্ত্র চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করে, আবার সেই চিন্তাকে সীমার মাঝে আনতে হুদুদ নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম বলে—চিন্তা করো, ভাবো, প্রশ্ন করো, কিন্তু তা হতে হবে সত্য, ইনসাফ ও নৈতিকতার কাঠামোর ভিতরে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের বাস্তবায়ন

ইসলামের পরিপূর্ণতা বুঝা যায় যখন তা ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়। ইবাদত, আখলাক, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সাম্য, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, নারীর সম্মান ও অধিকার, মানবিক সহানুভূতি—সব কিছুই ইসলামে ব্যাখ্যাত হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারব্যবস্থা, যুদ্ধনীতি, সংখ্যালঘুর অধিকার—সব ক্ষেত্রেই ইসলাম পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

আধুনিক বাস্তবতায় ইসলামের কার্যকারিতা

বর্তমান বিশ্ব যে পশ্চিমা মতবাদভিত্তিক চিন্তাধারার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তা ক্রমেই মানবতাবিরোধী, বৈষম্যমূলক এবং আত্মবিধ্বংসী হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ভোগবাদকে মূল চালিকাশক্তি করে এই মতবাদ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক, অসহিষ্ণু ও উদ্দেশ্যহীন করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম এমন একটি বিকল্প দর্শন ও জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করে, যা আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানব কল্যাণের সমন্বয় সাধন করে।

ইসলামিক শাসনব্যবস্থা যখন বাস্তবে কার্যকর হয়, তখন তা শান্তি, নিরাপত্তা ও সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। যেমনটি ইতিহাসে মদীনার রাষ্ট্র, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত, বা ওসমানীয় সালতানাতে দেখা গেছে। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে যে, ইসলামের জীবনব্যবস্থা কেবল তত্ত্ব নয়, বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তা তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

খ. বুদ্ধিবৃত্তির পুনর্নির্মাণ

চিন্তা (ফিকর) হলো মানব জীবনের সর্বাগ্রে প্রভাবশালী একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি ও সমাজের গতিপথ নির্ধারণ করে। প্রতিটি মানবকর্মের মূল ভিত্তি চিন্তা; সেই চিন্তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এ কারণে, চিন্তার স্বচ্ছতা, গভীরতা ও দিকনির্দেশনাই নির্ধারণ করে যে কোন জাতি বা সম্প্রদায় কতদূর অগ্রসর বা পিছুহটে। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর পতনের গভীরতম কারণগুলোর অন্যতম হলো চিন্তার সংকীর্ণতা, অবহেলা ও অপর্যাপ্ততা।

বর্তমান বিশ্ববাসী যে চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা বহুমাত্রিক সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি। পশ্চিমা দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যর্থতাকে স্বীকার করে আসছেন। বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক অ্যাডওয়ার্ড ডি বোনোর বিশ্লেষণ মতে, আধুনিক পশ্চিমা চিন্তাধারা তার গভীরে অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য অক্ষম হয়ে পড়েছে যুগের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নিজেকে মানিয়ে নিতে। এটি একটি আত্মতুষ্টিমূলক, অপর্যাপ্ত ও বিপজ্জনক চিন্তার মডেল, যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে টিকে থাকতে পারেনি।

এ বিপর্যয়ের মধ্যে, ইসলামি দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো 'ইজতিহাদ' বা যুগোপযোগী নবনির্মাণের ধারণা। ইসলাম শুধুমাত্র একটি কালজয়ী বিশ্বাস নয়; এটি একটি জীবনব্যবস্থা, যা যুগে যুগে নিজেকে নবায়িত করে। ইসলামের মহানবী (সা.) এর বাণী, "আফলা তাতাফাক্কারুন?" (তোমরা কি চিন্তা করো না?), আমাদের স্বাধীন চিন্তার আহ্বান জানায়। ইসলাম যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রতি উৎসাহ দেয়, যেখানে ব্যক্তি কোরআনের নির্দেশনা ও নবীজীর সান্নিধ্যের মধ্যে থেকে চিন্তার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম সমাজে চিন্তার এ সংকীর্ণতা মূলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত। উচ্চাকাঙ্খার অভাব, দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং ঐতিহাসিক নেতাদের প্রতি অবাধ্য শ্রদ্ধাবোধ এই সংকটের শিকড়। অনেক শিক্ষার্থী ও যুবক তাদের উস্তাদ বা নেতাদের স্তর অতিক্রমের চিন্তাকেই বেআদবী মনে করে। এর ফলে চিন্তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, যা সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা মুসলিম উম্মাহর চিন্তার অবনতি ও পতনের সরাসরি প্রতিফলন। বহু মুসলিম রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকারের প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিক রাষ্ট্রশাসনের মডেলগুলো ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যবিধানহীনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অধিকারী সমাজ থেকে অনেক ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা এমন এক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যা আল্লাহ প্রদত্ত নীতির পরিবর্তে মানুষের রচিত আইন ও আদর্শকে প্রাধান্য দেয়। রাজনৈতিক দুর্নীতি, কর্তৃত্ববাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মধ্যে মুসলিম দেশগুলো বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যা চিন্তার মুক্ত প্রবাহ ও সৃজনশীলতা বন্ধ করে দিচ্ছে।

সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিম সমাজে পশ্চিমা আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণ, পারস্পরিক সম্মানহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতা ব্যাপক হারে দেখা যায়। এতে মুসলিম যুবসমাজ বিভ্রান্ত ও আত্মপরিহারী হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি চিন্তাকে সংকীর্ণ ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। একদিকে তারা আধুনিক বিশ্ববুদ্ধির বাহ্যিক দিক গ্রহণ করে, অন্যদিকে ইসলামের গভীর তত্ত্ব ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করে। এতে আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং মুলতবি চিন্তায় অবস্থিত থাকায় বাস্তবিক সংস্কার ও উন্নয়নের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।
সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর পতন প্রতিহত করতে ও উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে আমাদের অবশ্যই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করে চিন্তার পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন করতে হবে। শিক্ষা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামকে আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, যাতে চিন্তার স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও উন্নয়নের পথ সুগম হয়। তবেই আমরা বিশ্ববাসীর কাছে মর্যাদাপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারব।

গ. আত্মপরিচয়

একটি জাতির আত্মপরিচয়ই তার অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদার ভিত্তি। মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয় কেবল জাতিগত বা সাংস্কৃতিক নয়, বরং এটি ঈমান, ইসলামি চিন্তা ও কুরআনিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এই আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মুসলমান নিজেকে আল্লাহর খলিফা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হিসেবে চিহ্নিত করে। আত্মপরিচয় হারালে তার ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও জাতি—তিনটিই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়।

কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপরিচয়

আল-কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানবজাতিকে তাদের সৃষ্টিগত পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করা।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থঃ অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।[৫৫]

এই আয়াতে মানবজাতির মর্যাদার ঘোষণার পাশাপাশি বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ তার স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় হারালে 'আসফালাস সাফিলীন'-এর স্তরে নেমে যায়।

---

[৫৫] সূরা ত্বিন আয়াত- ৪

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ

অর্থঃ তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে। [৫৬]

কুরআনের চিন্তাধারা তার ধারককে শুধু আত্মসম্মানই দেয় না, বরং তাকে দুনিয়ার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য করে তোলে। আত্মপরিচয়ের শক্তি: নববী যুগের দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে উসামা বিন জায়েদ (রা.)-এর ঘটনা আত্মপরিচয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা বংশের দিকে দেখেন না; তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।"[৫৭] এ হাদিসে স্পষ্টভাবে জাতিগত শ্রেষ্ঠতার ধারণা নাকচ করা হয়েছে, এবং ঈমান ও চরিত্রকে মূল ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আত্মপরিচয়ের বিলুপ্তি ও ফলাফল: ইতিহাসের শিক্ষা

আত্মপরিচয় বিসর্জনের পরিণতি ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে। বসনিয়ার মুসলমানরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বিসর্জন দিয়েও সার্বদের "আপন" হতে পারেনি। একই ঘটনা ঘটেছিল স্পেনে, যখন মরিস্কো মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানিয়েও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়নি, বরং তাদের নিপীড়ন করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, সহাবস্থানের নামে পরিচয় বিসর্জন দিলে নিরাপত্তা ও মর্যাদা উভয়ই হারাতে হয়।

সমকালীন বাস্তবতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা

আজকের মুসলিম সমাজেও একই আত্মপ্রবঞ্চনার চিত্র ফুটে ওঠে। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, পোশাকে ও মতাদর্শে পশ্চিমা মানদণ্ডকে অনুসরণ করেও মুসলমানরা সম্মান পায় না। আত্মপরিচয়বর্জিত এই শ্রেণি তথাকথিত আধুনিকতা ও 'ইন্টার ফেইথ হারমোনি'-এর নামে নিজস্ব বোধ ও বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে বস্তুত আত্মাবমাননার শিকার হচ্ছে। অথচ সম্মান ও মর্যাদার পথ আত্মপরিচয়ের মধ্যেই নিহিত। একজন মুসলমানের সম্মান, শক্তি ও মর্যাদা কেবল তার অর্থসম্পদ বা সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে তার ঈমান, চিন্তা ও ইসলামের প্রতি নিষ্ঠার ওপর। আত্মপরিচয় রক্ষা না করা মানে হলো—নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে ফেলা। অতএব, বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাইলে মুসলমানদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত নিজের পরিচয়কে আত্মস্থ করা, তা ধারণ করা এবং তা ভিত্তি করেই জ্ঞান, সংস্কৃতি ও নেতৃত্বে পুনরুত্থান সাধন করা।

ঘ. ইজতিহাদের পুনর্জাগরণ

ইসলাম একটি চিরন্তন ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ইজতিহাদের ধারণা, যা মানবজীবনের পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় শরিয়াহর চিরন্তন নীতিসমূহকে

[৫৬] সূরা ত্বিন আয়াত ৫

[৫৭] *সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪*

প্রয়োগের একটি কার্যকর পদ্ধতি। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মুসলিম সমাজে যখন চিন্তাগত স্থবিরতা নেমে এসেছে, তখন তা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের দিকে পরিচালিত করেছে। বর্তমান যুগে পুনরায় মুসলিম উম্মাহর জাগরণ ও নেতৃত্ব পুনর্গঠনের জন্য ইজতিহাদের পুনর্জাগরণ অনিবার্য।

ইজতিহাদ শব্দটি এসেছে আরবি "জুহদ" ধাতু থেকে, যার অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম বা সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। শরিয়াহর নির্ধারিত মূলনীতি ও লক্ষ্যসমূহ (মাকাসিদ) অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন বাস্তবতা ও সমস্যার সমাধানে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গভীর চিন্তাচর্চা করাই হচ্ছে ইজতিহাদ। এটি কেবল একটি আইনি পদ্ধতি নয়; বরং এটি ইসলামি সভ্যতার চিন্তাগত প্রাণ।

ইজতিহাদের শক্তির মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম যুগের পর থেকেই জ্ঞান, সভ্যতা ও প্রযুক্তিতে মুসলমানরা অগ্রসর হয়। আল-গাজালি, ইবনে রুশদ, ইবনে তাইমিয়া, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি প্রমুখ মনীষীরা নতুন যুগ ও চ্যালেঞ্জের মুখে ইজতিহাদ করে সমাজকে আলোকিত করেন। ইজতিহাদের মাধ্যমে কেবল ফিকহ নয়, বরং দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, এমনকি নৈতিকতাও ইসলামের আলোকে পুনঃব্যাখ্যার সুযোগ পায়।

কিন্তু চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর পর "بابُ الاجتهاد مُغلق" (ইজতিহাদের দরজা বন্ধ) ঘোষণা করে দেওয়া হলে ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে তাকলিদ (অন্ধ অনুসরণ) প্রাধান্য পায় এবং চিন্তা-সৃজনশীলতা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এই জড়তা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত পতনের ভিত্তি রচনা করে।[৫৮]

আজকের মুসলিম বিশ্বে আমরা এক অভূতপূর্ব সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি—ধর্মীয় মূল্যবোধের সংকট, আইনত শূন্যতা, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে পশ্চাদপদতা, এবং সর্বোপরি ইসলামি আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে এক গভীর ব্যবধান। এসব সমস্যার উত্তর কেবল অতীতের মীমাংসাগুলো কপিপেস্ট করে দেওয়া যায় না। বরং চাই—প্রেক্ষিতভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও ইসলাম-সম্মত সৃজনশীল চিন্তা।

ইসলামি ব্যাংকিং, বায়োটেকনোলজি, জেন্ডার প্রশ্ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রাষ্ট্রনীতি, পরিবেশনীতি—এসব ক্ষেত্রেই নবীন সমস্যাগুলোর শরিয়াহসম্মত সমাধান বের করার জন্য ইজতিহাদ অপরিহার্য।

ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা

ইজতিহাদ মানেই খেয়ালখুশিমতো সিদ্ধান্ত নয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা—

১। কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি ও চেতনায় ভিত্তিশীল,

২। উসুলুল ফিকহ, কিয়াস, ইজমা, মাসলাহা ইত্যাদি শরিয়াহ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে,

৩। নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ আলেমদের দ্বারা পরিচালিত হয়,

৪। প্রয়োগের আগে উম্মাহর বৃহৎ স্বার্থ (মাসলাহা আম্মা) বিবেচনা করে।

----

[৫৮] Ijtihad and Renewal of Islamic Thought, Mohammad Hashim Kamali, IIIT, 2006.

অতএব, ইজতিহাদ একটি গভীরতর বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঈমানদীপ্ত আমানত।

ইজতিহাদ ইসলামি সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক স্পন্দন। এটি পুনর্জীবিত না করলে উম্মাহর পুনর্জাগরণ অসম্ভব। ইসলামের শাশ্বত নীতিমালা ও সমকালীন বাস্তবতার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করাই ইজতিহাদের উদ্দেশ্য। অতএব, ইসলামি পুনর্জাগরণ কেবল আবেগ বা ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নয়; বরং একটি সুসংহত, যুক্তিনির্ভর, এবং আত্মপরিচয়ে দৃঢ় চিন্তার নাম—যার প্রাণ হচ্ছে 'ইজতিহাদ'।

ঙ. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধরো এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।" [৫৯]

মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো অভ্যন্তরীণ বিভাজন। মাজহাব, ভাষা, জাতি, ভূখণ্ডের কারণে আমরা একে অপরকে শত্রু ভেবে বসি। অথচ সাহাবাদের যুগে উম্মাহ ছিল একটি শরীরের মতো—এক অংশ আঘাত পেলে পুরো দেহ কেঁপে উঠত। আজ প্রয়োজন সেই ঐক্যের, যেখানে জাতিগত সীমা নয় বরং ঈমান হবে বন্ধনের ভিত্তি।

- সত্যিকারের ঐক্য কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে অনুসরণের উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জাতীয়তা, বর্ণ ও ভাষাগত পার্থক্য ভুলে ইসলামী পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।কুরআন ঘোষণা করে:

  "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরের ভাই।" [৬০]
- দ্বীনি ও বৈষয়িক বিষয়ে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা করা। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিভিন্ন দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। উম্মাহর সমস্যাগুলিকে যৌথভাবে সমাধানের চেষ্টা করা।
- ফিকহ ও মতবিরোধকে দয়া ও আদবের সঙ্গে মোকাবিলা করা।ইখতেলাফ বা মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক, তবে তা যেন বিভাজনের কারণ না হয়।
- ঘৃণা, হিংসা ও বিভাজনমূলক চিন্তা পরিহার করা। মুসলিমদের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো, যেমন: গীবত, অপবাদ, ফেরকা নির্ভর বিদ্বেষ — এসব বন্ধ করতে হবে।

চ. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের জীবন আদর্শ অনুসরণ করা

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা বিশ্বাস, আচরণ, নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্পর্কিত সব বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই জীবনব্যবস্থার চূড়ান্ত আদর্শ ও বাস্তব নমুনা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর প্রশিক্ষিত

---

[৫৯] সূরা আলে ইমরান: ১০৩

[৬০] সূরা হুজুরাত ১০

সাহাবিগণ। তাঁদের জীবন কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য নয়; বরং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি, সামাজিক সুবিচার, জ্ঞান ও নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ।

আজ মুসলিম উম্মাহর যে পতন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার অন্যতম মূল কারণ—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের অনুসরণ থেকে বিচ্যুতি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে—তাঁদের জীবনের আদর্শকে পুনরায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [৬১]

এই আদর্শ একান্তভাবে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব, যুদ্ধনীতি, অর্থনৈতিক ন্যায়, পারিবারিক দায়িত্ব, প্রতিবেশী সম্পর্ক, সংখ্যালঘু অধিকার, এমনকি পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন নামাযে ছিলেন নিবেদিত, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন বীর, রাজনৈতিক কূটনীতিতে ছিলেন দূরদর্শী, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে ছিলেন আপসহীন। তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতা একত্রে চলেছে পরিপূর্ণ ভারসাম্যে। রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের জীবন ছিল কেবল ধর্মীয় নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা নির্মাণের বাস্তব রূপরেখা। এই আদর্শ শুধুমাত্র মসজিদে নয়, স্কুল, সংসদ, আদালত, পরিবার, ব্যবসা, সংস্কৃতি—সবখানেই কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলমানদের পুনরুত্থান ঘটবে তখনই, যখন তাঁরা কেবল 'ঐতিহ্যগত মুসলমান' হয়ে নয়, বরং 'চেতনায় মুহাম্মাদি' হয়ে উঠবে।

ছ. আদর্শ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, ওমর ইবনে খাত্তাব, হারুন-আর-রশীদের মতো নেতৃত্ব আবারও গড়ে তুলতে হবে—যারা ছিলেন আত্মবিসর্জনকারী, বিচক্ষণ এবং ঈমানদার। আজকের মুসলিম জগতের দুরবস্থার পেছনে বড় কারণ হলো লোভী, কর্তৃত্ববাদী ও জ্ঞানহীন নেতৃত্ব। এর বিপরীতে তরুণ প্রজন্মকে আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। নেতৃত্ব হলো উম্মাহর চালিকা শক্তি। আজ উম্মাহর দুর্দশা, অপমান, বিভক্তি ও ব্যর্থতার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আদর্শ নেতৃত্বের অনুপস্থিতি। মুসলিমদের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন—তাকওয়াবান, দূরদর্শী, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃত্বের বিকাশ। এই নেতৃত্ব হবে চিন্তাশীল, কর্মনিষ্ঠ, ন্যায়বান ও উম্মাহর সেবায় নিবেদিত।

---

[৬১] সূরা আহযাব ২১

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন..." [৬২]

জ. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণার পুনর্জাগরণ

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমরা ছিল জ্ঞানের নেতা—ইবনে সিনা, আল-খাওয়ারিজমি, ইবনুল হায়সাম, ইবনে রুশদের মতো জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। আজকের দিনে মুসলমানদের উচিত আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব নেতৃত্বে ফিরে আসা।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূল ভিত্তি। ইসলামী ইতিহাসে শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি ছিল অসাধারণ গুরুত্ব। খলিফাদের যুগে "বাইতুল হিকমা" এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আধুনিক বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণার পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমরা ছিল জ্ঞানের নেতা—ইবনে সিনা, আল-খাওয়ারিজমি, ইবনুল হায়সাম, ইবনে রুশদের মতো জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। আজকের দিনে মুসলমানদের উচিত আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব নেতৃত্বে ফিরে আসা।

ঝ. ইলম ও গবেষণার প্রসার

ইসলামের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়গুলোর অন্যতম হলো—ইলম বা জ্ঞানের বিকাশ এবং গবেষণার প্রতি অগাধ উৎসর্গ। এই ইলম কেবল ধর্মীয় অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং কুরআন-হাদিসের আলোকে জাগ্রত একটি মুক্ত, সক্রিয়, বিশ্লেষণধর্মী ও অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দিয়েছিল, যা বিশ্বসভ্যতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আজকের মুসলিম জাহানে পতনের অন্যতম মূল কারণ হলো—ইলমের প্রকৃত ভাব, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি থেকে বিচ্যুতি এবং গবেষণার সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা। আত্মপ্রবঞ্চনার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জাতি কখনো সভ্যতা নির্মাণ করতে পারে না। জ্ঞানচর্চা, চিন্তাভাবনা ও গবেষণা ছাড়া কোনো উম্মাহ তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা প্রথম যে ওহি নাজিল করেন তা ছিল—

---

[৬২] সূরা নূর: ৫৫

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ

অর্থঃ “পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” [৬৩]

সাহাবিগণ ও পরবর্তী প্রজন্ম ইলমকে কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে নয়, বরং এক মহাসমুদ্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যা বিশ্বাস, সমাজ, রাষ্ট্র, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ন্যায়, ও দর্শনের প্রতিটি প্রবাহকে সঞ্জীবিত করেছিল।

ইলম ও গবেষণা মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয়, আত্মবিশ্বাস ও সভ্যতাগঠনমূলক শক্তির মেরুদণ্ড। যেই জাতি ইলমে এগিয়ে, তার পতন অসম্ভব। আবার, যে জাতি গবেষণাহীন, চিন্তাহীন, সে অন্যের তৈরি চিন্তা ও দর্শনের খাদ্য হিসেবে পরিণত হয়। সুতরাং আজকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মুসলমানদের আবার সেই ইলমচর্চার দীপ্ত, সাহসী ও বৈশ্বিক ধারায় প্রবেশ করতে হবে।

ঞ. নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনার উন্নয়ন

যে সমাজে মিথ্যা, দুর্নীতি, লোভ ও স্বার্থপরতা বেড়ে যায়, সেখানে পতন অনিবার্য। মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের পেছনে নৈতিক অবক্ষয় বড় ভূমিকা রেখেছে। এখন প্রয়োজন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রপর্যায়ে নৈতিকতা চর্চার আন্দোলন—যেখানে ইসলামি আদর্শ যেমন: সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ইখলাস (নিষ্ঠা) থাকবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে। একটি জাতির মৌলিক গুণাগুণ—তার চরিত্র, মূল্যবোধ ও আত্মিক চেতনা দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষ যত জ্ঞানী, ধনী বা প্রভাবশালীই হোক না কেন, যদি তার মধ্যে নৈতিক দৃঢ়তা ও আল্লাহভীতি না থাকে, তবে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয় এবং সমাজকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ঠিক সেইরকম, মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ হলো—নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনাবোধের চরম অবক্ষয়।

- কুরআন-হাদিসভিত্তিক আদর্শ শিক্ষার পুনর্গঠন

– ঈমান, তাকওয়া, আখিরাত, গোনাহ ও তওবা । এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা চর্চা করা।

- সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের উদ্যোগ

– ইসলামি দাওয়াহ মিশন, স্কুল, যুবসংগঠন, পরিবারভিত্তিক চরিত্র প্রশিক্ষণ।

– “মুসলমান মানেই নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ” এই বার্তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

- নীতি-আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব গঠন

– কেবল ক্ষমতার রাজনীতিতে নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

---

[৬৩] সূরা আলা'ক ১

ট. অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন

মুসলিম বিশ্বের বহু দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও বহির্ভরশীলতা ও দুর্নীতির কারণে তাদের উন্নয়ন আটকে আছে। ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি যেমন—যাকাত, ওয়াকফ, সুদমুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদিকে বাস্তবায়ন করলে অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য ও বৈষম্য অনেকটাই দূর করা সম্ভব।

মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক পুনর্জাগরণের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা একটি মৌলিক ও অপরিহার্য শর্ত। ইতিহাসের যেকোনো স্বর্ণযুগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তখনকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, বরং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী ছিল। কারণ, ইসলাম অর্থনীতিকে শুধু দুনিয়াবি বিষয় নয়, বরং দ্বীনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে হালাল ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জন, সম্পদের সুষম বণ্টন, এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য জাকাত, সাদাকা, ওয়াক্ফ, কারজে হাসানার মতো যেসব ব্যবস্থা দিয়েছে, তা মুসলিম সমাজকে আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল একটি জাতিতে পরিণত করার পূর্ণ সামর্থ্য রাখে। আজকের মুসলিম বিশ্ব—যেখানে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও—বহুজাতিক করপোরেশন, ঋণনির্ভর বাজেট, এবং সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুসলিম দেশগুলো কাঁচামাল রপ্তানি করে পশ্চিমা বিশ্বে তৈরি প্রযুক্তি ও ভোগ্যপণ্য আমদানি করে, যা একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরনির্ভরতাকে সৃষ্টি করছে। অথচ ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে মুসলিম সমাজ—বিশেষ করে রাসুল ﷺ ও খলিফাগণের যুগে—বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে ইহুদিদের একচেটিয়া বাজার ভেঙে দিয়ে মদিনায় স্বাধীন মুসলিম অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া ইসলামের শিক্ষা, দাওয়াহ, নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রীয় সংহতির বাস্তবায়ন অসম্ভব। দাওয়াহ তখনই কার্যকর হয়, যখন তা হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর; নেতৃত্ব তখনই নীতিবান হয়, যখন তা ঋণমুক্ত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়। তাই মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি অর্থনৈতিক চিন্তা ও উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে, যা তাদের নিজস্ব পণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করবে, কৃষি, শিল্প, ও প্রযুক্তিতে নিজেদের সক্ষমতা বাড়াবে, এবং দান-সদকার পরিবর্তে হালাল ব্যবসা ও স্বাবলম্বিতার দিকে ফিরিয়ে নেবে।

স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সুদভিত্তিক ব্যবস্থা ইসলামি সমাজের জন্য শুধু হারাম নয়, বরং এটি একটি শোষণ ও নিঃশেষীকরণ ব্যবস্থার অংশ। পাশাপাশি, ওয়াক্ফ ও জাকাত ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং সমাজকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যাতে মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগণ উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত হতে পারে।

সবশেষে, আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। একজন মুসলমান যদি তার জীবিকার জন্য অন্য জাতির দরজায় নির্ভরশীল থাকে, তবে তার চিন্তা, বিশ্বাস ও

জীবনদর্শনও সেই জাতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কাজেই, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা শুধু আর্থিক মুক্তি নয়, বরং এটি একটি আদর্শভিত্তিক সভ্যতা পুনর্গঠনের বুনিয়াদি ভিত্তি।

ঠ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মুসলিম সংহতি

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও কৌশলগত ঐক্য না থাকায় ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ অনেক মুসলিম অঞ্চলে চলছে রক্তপাত। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহ নানা রাজনৈতিক বিভাজন, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং সামাজিক সংকটে জর্জরিত। এমন বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মুসলিম সংহতির পুনর্গঠন একটি অত্যন্ত জরুরি ও কৌশলগত প্রয়োজন। ইসলাম একটি সামষ্টিক জীবনব্যবস্থা, যেখানে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থঃ “নিশ্চয়ই মু’মিনগণ পরস্পরের ভাই ভাই। ” [৬৪]

রাসূল (সা.)-এর বাণী অনুসারে, “সমস্ত মুসলমান একটি দেহের ন্যায়; এক অঙ্গ ব্যথা পেলে পুরো দেহই কষ্ট অনুভব করে” [৬৫] । এই নীতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। সার্বিকভাবে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মুসলিম সংহতি কেবল আবেগতাড়িত কোনো ধারণা নয়; বরং এটি একটি রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ থেকেছে, তখনই তারা সভ্যতা ও ন্যায়ের নেতৃত্ব দিতে পেরেছে। আজও সেই ঐক্য, সংহতি এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার পুনরুদ্ধারই মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের মূল চাবিকাঠি।

---

[৬৪] সূরা হুজুরাত ১০

[৬৫] মুসলিম : ৪৬৮৭